বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাচিন্তা : কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনা

মো. জাবেদ ইকবাল*

[সারসংক্ষেপ : মানব-ইতিহাসের প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যতম। পাশ্চাত্য ঘরানার বিশ্ববিদ্যালয় ভারতবর্ষে ঔপনিবেশিক-আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও, প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে এদেশে নিজস্ব ধারার বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। বিউপনিবেশিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে সেই বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-ব্যবস্থাকে মূল্যায়ন করা যায়। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবনে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক প্রভাবগুলোকে চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন প্রচেষ্টাই বিউপনিবেশায়ন। উপনিবেশের অধিবাসী হয়েও কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন আদ্যোপান্ত উপনিবেশ-বিরোধী। শিক্ষা-বিষয়ক প্রবন্ধগুলোতে তিনি বিউপনিবেশিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও সুকুমার বৃত্তি চর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন করতে ও ঔপনিবেশিক-পশ্চাৎপদতার মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। তিনি দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-জীবন-সংস্কৃতির বিশেষত্ববহুল সর্বজনীন শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞান আহরণ, মুক্তবুদ্ধিচর্চা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনচিত্তের জাগরণ, সুকুমার বৃত্তিচর্চা, বিবিধ ধর্মীয় শিক্ষা, ভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।]

এক.

বাংলা সাহিত্যে 'বিদ্রোহী কবি'[১] অভিধায় খ্যাত কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) ছিলেন "একাধারে কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, সঙ্গীত রচয়িতা, সঙ্গীত শিল্পী, সঙ্গীত পরিচালক, সাংবাদিক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী" (সুশীল, ২০১২ : ১৬-১৭)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে "নবজাগ্রত বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্তশ্রেণীর চৈতন্যের সাগরমন্থন শেষে" (বিশ্বজিৎ, ১৯৯৩ : ৩৩) বাংলা সাহিত্যে তাঁর দীপ্ত আবির্ভাব। উপনিবেশিত ভারতবর্ষের শৃঙ্খলিত সমাজপ্রবাহে তিনি দেখা দেন 'বিদ্রোহী' ও 'বিপ্লবী'র ভূমিকায়। সমালোচকের মতে :

> বিংশ শতাব্দীর বাঙালি হিন্দু-মধ্যবিত্তের ক্রম-অপসৃয়মান, ভগ্নপক্ষ ও নৈরাশ্যমগ্ন ও চূর্ণস্বপ্ন সমাজচেতনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে নবজাগ্রত বাঙালি মুসলমান-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চেতনা-স্পর্শী নজরুল ছিলেন মূলত তারুণ্যশাণিত, আবেগ-সংরাগে উচ্চকিত, জীবনার্থে স্বপ্নময় ভবিষ্যতে বিশ্বাসী, অস্তিত্ব-বিস্তারে সীমাহীন, রোমান্টিক অনুভবে প্রেম-সৌন্দর্যমুগ্ধ এবং অচরিতার্থতা ও ব্যর্থতায় ছিলেন প্রতিবাদী, বিদ্রোহী। (আকরম, ১৯৮৫ : ৬৭)

স্বীয় লেখনীকে নজরুল পরিচালনা করেছেন যাবতীয় অসত্য, অন্যায়, অকল্যাণ, অমঙ্গল ও

---

*প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।

সাম্প্রদায়িক-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে। "তিনি কেবল লেখনী পরিচালনা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না, সক্রিয়ভাবে প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, জাতীয়তাবাদী ও সংগ্রামশীল রাজনীতি, সংগঠন ও সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন" (রফিকুল, ১৯৯১ : ২৫৭)।

রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ ও সাহিত্য রচনা করেও তিনি "সর্বাধিক আলোচিত, জনপ্রিয় ও বিতর্কিত এবং স্বীয় সৃষ্টিবৈচিত্র্যের এক স্বতন্ত্র উত্তরাধিকার নির্মাণে সক্ষম ওজস্বী সাহিত্যিক-ব্যক্তিত্ব হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) পরেই" (বিশ্বজিৎ, প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ৭১) স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিধি-সম্পন্ন হলেও তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বহুমুখী প্রতিভার একটি বলয় নির্মাণ করতে পেরেছিলেন।

পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন বিষয়ে কাজী নজরুল ইসলাম সম্পাদকীয় প্রবন্ধ রচনা করছেন এবং কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে বিভিন্ন স্থানে অভিভাষণ প্রদান করেছেন। সে সকল প্রবন্ধ ও অভিভাষণে প্রকাশিত হয়েছে শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ভাবনা— যা শিক্ষা বিষয়ে তাঁর নিজস্ব দর্শনকে প্রকাশ করে। সেখানে তিনি ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত শিক্ষালয় ও স্বদেশি শিক্ষার কথা বলেছেন। ঔপনিবেশিক প্রতিকূল পরিবেশ-প্রতিবেশে স্বীয় জীবৎকাল অতিবাহিত করলেও তিনি ছিলেন আপদমস্তক উপনিবেশ-বিরোধী। বিশশতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে সম্পূর্ণ উপনিবেশবিরোধী অবস্থান থেকে তিনি যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার কথা বলেছেন তাকে আমরা একুশ শতকের প্রথমার্ধে দাঁড়িয়ে বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাভাবনার আলোকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারি। তাই, বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বরূপ ও পাশ্চাত্যের আধুনিক গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সাথে তার ফারাক নির্দেশপূর্বক বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষাব্যবস্থার একটা রূপরেখা নির্দেশ ও দেশজ ঐতিহ্য নির্ভর সমাধান প্রস্তাব এবং সেই তত্ত্বের আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিবৃত্ত, বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও তার শিক্ষাব্যবস্থার একটা রূপরেখা নির্দেশ করা হয়েছে। তার কারণ, অন্যান্য যে কোন পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যেখানে কেবল শিক্ষা দেয়া, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়কে পুঁজির চাপ সহ্য করে জ্ঞান উৎপাদন ও চর্চার দায় বহন করতে হয়। সে কারণে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যতটা সহজে পুঁজির চাপ সুরাহা করতে পারে, বিশ্ববিদ্যালয় সহজে ততটা পারে না। এই দুয়ের মাঝে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে না বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রায়শই আত্মসংকটে ভোগে। উনিশ শতকের ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা ও সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবস্থা তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তা ছাড়া, উপনিবেশিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এ অঞ্চলের জ্ঞানজগৎকে সচরাচর পাঠক্রমেই অন্তর্ভুক্ত করতে চায় না কিংবা করলেও তা নিতান্তই সামান্য পরিমাণে। কারণ, এখানকার জ্ঞানজগত ইউরোপকে শুধু অনুকরণই করে না, ধারণ করে দেড়শো বছর আগের ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গিকে। ফলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো এবং শিক্ষাব্যবস্থা হয়ে পড়েছে উপনিবেশিত। উপনিবেশিত মানসিকতার কারণে এখানে জ্ঞানোৎপাদনের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিয়েছে। এই বন্ধ্যা দশার অন্যতম

কারণ, আমাদের জ্ঞান সম্পর্কিত ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গি। যে দৃষ্টিভঙ্গির জন্য আমরা পাশ্চাত্য জ্ঞানের পরিমণ্ডলকে সর্বজনীন বা স্থান-কাল নিরপেক্ষ এবং ব্যবহারিক উপযোগিতাসম্পন্ন ও উৎকৃষ্ট বলে মেনে নিয়ে দেশীয় জ্ঞানজগৎকে অবজ্ঞা করি।

দুই.

ইংরেজি 'university' শব্দের পারিভাষিক শব্দ হিসেবে উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটি এসেছে। শব্দটির আমদানি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বলেন : "য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে অর্থাৎ য়ুনিভার্সিটির যে চেহারার সঙ্গে আমাদের আধুনিক পরিচয় এবং যার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষিত সমাজের ব্যবহার সেটা সমূলে ও শাখা-প্রশাখায় বিলেতি" (রবীন্দ্রনাথ ১৬ খণ্ড, ২০১২: ৩১৮)। আবার 'university' শব্দটি ইংরেজি ভাষার নিজস্ব শব্দ নয়। ইংরেজি ভাষায় শব্দটিকে আমদানি করা হয়েছে ল্যাটিন শব্দ 'universitas' থেকে যার আভিধানিক অর্থ 'সমগ্র' বা 'যৌথ' বা 'বিশ্ব' (নিজার, ২০১৮ : ২৩)।

আধুনিককালে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যে বৃহদায়তনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় তার উদ্ভব মধ্যযুগে ইউরোপে। তখন চার্চ পরিচালিত স্কুলগুলোতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রদান করা হত এবং তা সীমাবদ্ধ ছিল ধর্মতত্ত্ব এবং ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার মধ্যে। পরবর্তীতে সেখানে নগররাষ্ট্র সৃষ্টি আরম্ভ হলে প্রশাসনিক, আইন এবং বিচার-ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বার্থে প্রাতিষ্ঠানিক আইন শিক্ষার প্রয়োজন হয়। তখন আইন শিক্ষা দেয়ার জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল মূলত পাঠদানকেন্দ্রিক। তবে শিক্ষক, চার্চ বা শাসক নয়, ইউরোপের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল শিক্ষার্থীরা। রোমান ফৌজদারি এবং দেওয়ানি আইন শিক্ষার প্রয়োজনে বিশ্বে প্রথম ১০৮৮ সালে একটি যৌথ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ইতালির বোলোনিয়াতে যার ল্যাটিন নাম ছিল Universitas Bononiensis। বর্তমানে এর ইংরেজি নাম The University of Bononese। সেই হিসেবে বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়-ই বিশ্বের প্রথম প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। শিশির ভট্টাচার্য্যের মতে : "দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অদ্যাবধি শিক্ষাদানকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে, প্রাচীনত্বের দিক থেকে সেগুলোর মধ্যে প্রথম হচ্ছে বোলোনিয়া, দ্বিতীয় হচ্ছে প্যারিস" (শিশির, ২০১৮ : ৪৮)। তবে অন্য মতে : ৮৫৯ খ্রিষ্টাব্দে মরক্কোর ফেজ নগরে স্থাপিত আল কারুইন বিশ্ববিদ্যালয় (University of Al Quaraouiyine) পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়।

বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও নিয়ন্ত্রিত হত চার্চ দ্বারা, সে কারণে প্রথম দিকে এর সনদ প্রদান করার অধিকার ছিল না। ১১৫৮ সালের সেই অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয় বোলোনিয়ার মতো ডিগ্রি প্রদানের অধিকার পায় সেগুলো হল ফ্রান্সের প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় (University of Paris, ১১৫০) যা মিটনিমিক্যালি (Metonymically) Sorbonne বিশ্ববিদ্যালয় নামেও পরিচিত; ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (University of Oxford, প্রতিষ্ঠা : ১০৯৬, স্বীকৃতি : ১১৬৭); ইতালির মদেনা বিশ্ববিদ্যালয় (University of Modena and Reggio Emilia, প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি : ১১৭৫) এবং স্পেনের প্যেলেনসিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Palencia, ১২০৮-১২১২)।

প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বোলোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো প্রক্রিয়ায় নয়। বোলোনিয়া যদি হয়ে থাকে শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়, তবে প্যারিস হল শিক্ষকদের বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষকগণ প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেও এর অ্যাকাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নটরডেম ক্যাথিড্রাল প্রধানের অনুমতি প্রয়োজন হত। এমনকি পাঠক্রমের বিষয়বস্তুর ওপরও ক্যাথিড্রালের নজরদারি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি দেওয়ার অধিকার ছিল না। শিক্ষার্থীদেরকে ডিগ্রি নেওয়ার জন্য চার্চের অধীনে আবার পরীক্ষা দিতে হত। Jacques Verger প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেন :

> The Birth of the University of Paris can be interpreted as a kind of compromise between the parties involved. It allowed the masters, and the masters of arts in particular, certainly as early as 1208-10, to form themselves into an autonomous guild, to endow themselves statutes, to co-opt their new colleagues and to elude the direct control and exactions of the chancellor of Notre-Dame. (Verger, 1992 : 51)

কালের বিবর্তনে এবং সময়ের প্রয়োজনে এ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে পরিবর্তন এসেছে। প্রথমে আইনশাস্ত্র পাঠ মুখ্য থাকলেও পরবর্তীতে এক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চারটি অনুষদের উল্লেখ পাওয়া যায় : ক. আইন; খ. ধর্মতত্ত্ব; গ. চিকিৎসা; ঘ. কলা। যেহেতু ধর্মতত্ত্ব, চিকিৎসা এবং আইন শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতা ছিল, তাই এ সকল অনুষদকে 'উচ্চতর ধারা' বলা হত। কলা অনুষদের পাঠদানকৃত বিষয়বস্তুর ব্যবহারিক উপযোগিতা না থাকায় এটি 'নিম্ন ধারা' বলে বিবেচিত হত। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানববিদ্যা এবং বিজ্ঞান দুই-ই কলা অনুষদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এই অনুষদের আওতায় ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, পাটীগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সামান্য পরিমাণ যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হত। দর্শনকে আলাদা বিষয় হিসেবে পাঠ দেওয়া হত না। তৎকালে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষা ছিল না বললেই চলে, যেটুকু ছিল তাও কলা অনুষদের আওতাভুক্ত। কলা অনুষদ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ছিল : ক. ট্রিডিয়াম– ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র এবং যুক্তিবিদ্যা; খ. কোয়াড্রিয়াম– পাটীগণিত, জ্যামিতি, সঙ্গীত এবং জ্যোতিষশাস্ত্র। অনেক গবেষক মনে করেন, ট্রিডিয়াম এবং কোয়াড্রিয়াম থেকে অনার্স এবং মাস্টার্স ডিগ্রির রীতি এসেছে (নিজার, ২০১৮ : ২৮)। মধ্যযুগীয় এসকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাঠ্যবিষয় ছিল অনেকাংশেই অতীত-আশ্রয়ী। অতীত জ্ঞানের সুরক্ষা এবং গির্জার বিধি-বিধান শেখানোই মূল লক্ষ্য ছিল এই সকল প্রতিষ্ঠানের। জ্ঞানসৃষ্টির প্রবণতা ছিল না বললেই চলে। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা 'প্রথম প্রজন্ম'র বিশ্ববিদ্যালয় বলতে পারি। তবে রেনেসাঁসের সময় থেকে এই স্থবির অবস্থার অবসান ঘটতে থাকে।

উনিশ শতকে ব্রিটিশদের বিশ্ববিদ্যালয় ভাবনা সম্পর্কে জানা যায় Saint John Henry Newman (১৮০১-১৮৯০)-এর 'The Idea of a University' প্রবন্ধ থেকে। ১৮৫৪ সালে ডাবলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের (University College Dublin) ভিত্তি প্রতিষ্ঠার সময় কার্ডিনাল নিউমেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছিলেন : বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে 'School of Universal

Learning'। তাঁর মতে : বিশ্ববিদ্যালয় সর্বোচ্চ জ্ঞানের ধারক এবং সংরক্ষক, যার অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের বিকাশের মধ্য দিয়ে সমাজের বিকাশ ত্বরান্বিত করা। নিউমেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা বলেছেন তা সে সময়ের জন্য পশ্চাৎপদ এবং খ্রিষ্ট ধর্মীয় শিক্ষা-দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত সেই সময়কার ব্রিটিশদের বিশ্ববিদ্যালয়-ভাবনা। তবে উনিশ শতকের শেষের দিকে ব্রিটিশদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হতে শুরু করে।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইউরোপে বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত ধারণায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে। মধ্যযুগীয় কায়দায় সমাজের উচ্চ-শ্রেণির স্বল্প সংখ্যক শিক্ষার্থীকে লাতিন ভাষায় পাঠদানের পরিবর্তে এ সময় সেখানে গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আবির্ভাব ঘটে। এখানে উল্লেখ্য, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা অর্থ পুনঃঅনুসন্ধান বা re-search। গবেষণাকেন্দ্রিক এসকল বিশ্ববিদ্যালয়কে আধুনিক বা 'দ্বিতীয় প্রজন্ম'র বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করা হয়। এজাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক ভিত্তি হচ্ছে সার্বিক-জ্ঞানচর্চা ও তার প্রসার— যার মাধ্যমে তৈরি হবে আলোকিত মানব এবং প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ব-শান্তি। এসব প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষায় পাঠদান এবং গবেষণা সম্পন্ন করা হয়ে থাকে, ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলো জাতি-রাষ্ট্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, ১৭২৪-১৮০৪) এবং ভাষাতাত্ত্বিক ভিলহাল্ম হামবোল্ডট (Friedrich Wilhelm Christian Karl Ferdinand von Humboldt, ১৭৬৭-১৮৩৫) ছিলেন আধুনিক গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়[২] ধারণার রূপকার। দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট মনে করতেন : অধুনা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আনবে। শিক্ষকের ন্যায় শিক্ষার্থীরও পাঠক্রম বেছে নেবার অধিকার থাকা উচিত বলেও তিনি মনে করতেন। তাঁর বিবেচনায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী নেই। এখানে একজনের হওয়া উচিত উপদেষ্টা এবং অপর জন গবেষক (নিজার, ২০১৮ : ৩২)। তিনি বলেছেন :

> Just as primary instruction makes the teacher possible, so he renders himself dispensable through schooling at the secondary level. The university teacher is thus no longer a teacher and the student is no longer a pupil. Instead, the student conducts research on his own behalf and the professor supervises his research and supports him in it. (উদ্ধৃত, Clark, ২০০৭ : ৩৩৩)

১৮০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত (চালু হয় ১৮১০ সালে) জার্মানির বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় (মূল নাম Humboldt University of Berlin) হল ইউরোপের প্রথম গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়। গবেষণাকেন্দ্রিক এবং পাঠদানকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার বিষয়বস্তু, পাঠদান কৌশল, শিক্ষার্থী-মূল্যায়ন এমনকি ভালো শিক্ষক সম্পর্কিত ধারণাও ভিন্ন। পাঠদান-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের দায়িত্ব পাঠ্য-বিষয়কে যথাযথভাবে বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করা, যাতে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে বুঝতে পারে। এখানে শিক্ষার্থীদের কাজ যথার্থরূপে এই জ্ঞানকে মৌখিক বা লিখিতভাবে প্রকাশ করা এবং তা ব্যবহার করতে শেখা। অন্যদিকে, গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব কেবল একটি বিষয় যথাযথভাবে বোধগম্য ভাষায়

প্রকাশ এবং ব্যাখ্যা করা নয় বরং জ্ঞানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকা এবং শিক্ষার্থীদের সেই বিষয়ে উৎসাহিত করা এবং গবেষণার প্রশিক্ষণ দেয়া। এখানে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব শুধু কোন বিষয় বুঝা বা ব্যবহার করা নয় বরং সে বিষয়ে বর্তমানে আলোচিত সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করার পাশাপাশি অনাগত সমস্যার সমাধানও খোঁজা। ফলে পাঠদানকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে স্মৃতিনির্ভর পরীক্ষার উপর জোর দেয়, সেখানে গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য গবেষণাপত্র বা প্রবন্ধের উপর বেশি জোর দেয়, কারণ এর মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীকে গবেষক হিসাবে প্রস্তুত করা হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণাকেন্দ্রিক হলেও তা মেধার ভিত্তিতে সর্বজনের জন্য ছিল না বরং ছিল সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য। তবে আমেরিকার ল্যান্ড-গ্রান্ট[৩] বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রথমবারের মত মধ্যবিত্ত এবং কৃষক-সন্তানরা অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছিল। তাই বলা যেতে পারে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম জার্মানিতে হলেও তার বিকাশ হয়েছে আমেরিকায়।

হামবোল্ডটের জ্ঞানজাগতিক স্বাধীনতার ধারণা প্রথম আইনি ভিত্তি পায় যুক্তরাষ্ট্রে (নিজার, ২০১৮ : ৩৩)। পরবর্তীকালে জার্মানি, ফ্রান্সসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ তা গ্রহণ করে। উনিশ শতকের শেষার্ধে যুক্তরাষ্ট্রেই প্রথম উচ্চশিক্ষায় নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের সন্তানের আগমন ঘটে। ১৬৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত New College (১৬৩৯ সালে এর নতুন নামকরণ করা হয় Harvard University) যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে উইলিয়াম অ্যান্ড মেরি কলেজ (The College of William and Mary in Virginia, ১৬৯৩) এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় (Yale University, ১৭০১) প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাজকদের জন্য John Calvin (১৫০৯-১৫৬৪)-এর ধর্মতত্ত্ব এবং উচ্চবিত্তের সন্তানদের ক্ল্যাসিক পাঠদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এই সকল প্রতিষ্ঠান পাঠদানকেন্দ্রিক ছিল এবং অনুসরণ করত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে। পাঠদানকে শুধু ধর্মতত্ত্ব এবং ক্ল্যাসিকে সীমিত করার বিষয়ে বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিনের (Benjamin Franklin, ১৭০৬-১৭৯০) আপত্তি ছিল। তাই তিনি ১৭৪০ সালে প্যানসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (University of Pennsylvania) প্রতিষ্ঠা করেন। এরও প্রায় একশত বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষায় ব্যবহারিক এবং প্রায়োগিক বিষয়ের উপর জোর দেয়া শুরু হয়।

বিশ শতকে বিপুল পরিমাণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে সংস্কৃতি আমরা বিশ্ব জুড়ে লক্ষ করি, তার সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধে যুক্তরাষ্ট্রে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে মেরিল্যান্ডে অবস্থিত জন হপকিনস্ বিশ্ববিদ্যালয় (Johns Hopkins University, ১৮৭৬)। এটিকে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। এতে মুখ্য ভূমিকা রাখেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম আচার্য Daniel Coit Gilman (১৮৩১-১৯০৮)। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। সেখানে তিনি হামবোল্ডট বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের সাথে পরিচিত হন। পরবর্তীকালে গিলম্যানের পথ অবলম্বন করেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য Charles William Eliot (১৮৩৪-১৯২৬)। তিনি স্নাতক পর্বকে পাঠদানভিত্তিক এবং স্নাতকোত্তর পর্বকে গবেষণাভিত্তিক করে তোলেন– যা এখনো বর্তমান। পরবর্তী কয়েক দশকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় সকল ল্যান্ড-গ্রান্ট বিশ্ববিদ্যালয় এই মডেল অনুসরণ করে (নিজার, ২০১৮ : ৩৩-৩৪)।

যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত নীতিমালা গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় গড়তে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কৃষি-গবেষণা সম্প্রসারণের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার ১৮৮৭ সালে হ্যাচ্ অধ্যাদেশ (Hatch Act) পাশ করে। এই অধ্যাদেশ অনুসারে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়কে কৃষি গবেষণার জন্য ১৫,০০০ ডলার প্রদান করা হত প্রতি বছর। যুক্তরাষ্ট্রে কৃষির বিকাশে এই গবেষণা তহবিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তীকালে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান এবং নতুন প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে ১৯১৪ সালে স্মিথ-লিডার অধ্যাদেশ পাশ করা হয় (নিজার, ২০১৮ : ৩৬)।

তিন.

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ভূমিব্যবস্থার সংস্কারের পর দৃষ্টি ফেরায় শিক্ষাব্যবস্থার দিকে (মহীবুল, ২০০৭ : ১১)। ভারতের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকীকরণ করার মাধ্যমে ভারতবাসীকে একটা সুষম জীবন দানের কথা বলা হলেও কোম্পানি সরকার কর্তৃক শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের মূল লক্ষ্য ছিল ঔপনিবেশিক শাসনকে আরও শক্ত-ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা। ভারতে ব্রিটিশ শাসন যাতে দীর্ঘকাল বজায় থাকতে পারে, ব্রিটিশ অর্থনৈতিক শোষণে দেশীয় কলকব্জাগুলোকে যাতে আরো বেশি পরিমাণে কাজে লাগানো যায় এবং দীর্ঘকাল ব্যবস্থাটা টিকিয়ে রাখা যায় সেই লক্ষ্যে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকীকরণ কাম্য ছিল তাঁদের (মহীবুল, ২০০৭ : ১৯)। এই লক্ষ্য পূরণকল্পে লর্ড মেকলে (Thomas Babington Macaulay, ১৮০০-১৮৫৯) সহ অন্যান্য অ্যাংলিসিস্টগণ (Anglicist) মনে করতেন, ভারতবর্ষে দীর্ঘমেয়াদি শাসনকার্য পরিচালনার জন্য দাপ্তরিক এবং আদালতের ভাষা হওয়া উচিত ইংরেজি। ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি 'Minute on Education' শীর্ষক বক্তৃতায় স্বীয় পরিকল্পনা তিনি ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে :

> [....]To attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions whom we govern— a class of persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and in intellect. (Macauley, 1835)

এ লক্ষ্যে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে দাপ্তরিক এবং উচ্চ আদালতের ভাষা এবং আঞ্চলিক ভাষাগুলোকে নিম্ন আদালতের ভাষা হিসেবে চালু করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে : "আমাদের দেশে ইংরেজি শিক্ষার যখন প্রথম পত্তন হইয়াছিল তখন তাহার লক্ষ্য ছিল এই যে, ব্রিটিশ ভারতের রাজ্যশাসন ও বাণিজ্যচালনের জন্য ইংরেজি জানা দেশি কর্মচারী গড়িয়া তোলা" (রবীন্দ্রনাথ ১৬ খণ্ড, ২০১২ : ২৯৮)। ইংরেজিকে দাপ্তরিক এবং উচ্চ আদালতের ভাষা করার কারণে প্রশাসনে প্রচুর ইংরেজি জানা জনবলের প্রয়োজন হয়। এই চাহিদা মেটাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে দ্রুত অনেক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সবগুলো কলেজই মিশনারি ও ব্যক্তি-উদ্যোগে হয়েছিল তার কারণ কোম্পানির শাসনামলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য তেমন সরকারি অর্থ বরাদ্দ ছিল না। এমনকি ১৯০৪ সালের আগ পর্যন্ত ভারতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্রিটিশ-ভারত সরকারের প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য বেশি অর্থ বরাদ্দ ছিল না। কেবল উচ্চশিক্ষার জন্য

কয়েক বার কিছু অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত ঐসকল অধিকাংশ কলেজের শিক্ষার-মান ছিল খুবই খারাপ। এই সকল কলেজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হয়। ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্ম সেই মান নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে। সে সময় আড়াই লক্ষ রুপি ব্যয়ে ব্যক্তিগত কলেজগুলোর পাঠদানের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য আড়াই একর জায়গার উপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার কথা বলা হলেও, ঐ একই অর্থ দিয়ে মাদ্রাজ ও বোম্বে (পরবর্তীতে চেন্নাই ও মুম্বাই) বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো প্রতিষ্ঠায় পশ্চাৎপদ ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণাকে অনুসরণ না করে, অনুসরণ করা হয় ঘটনাচক্রে প্রতিষ্ঠিত এক বিরল প্রকৃতির বিশ্ববিদ্যালয় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় (১৮৩৬)[৪]কে । সে সময় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কেবল একটি পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল, পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠান ছিল না। প্রথমাবস্থায় লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় কেবল University College London (১৮২৬) এবং King's College London (১৮২৯)-এর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণ করত। ১৮৫৮ সাল থেকে তারা পাঠদান শুরু করে। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দিকে পাঠদানের পরিবর্তে শুধু ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা নেয়া হত। আজকাল যে কাজটি আমাদের দেশে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড করে থাকে। কলকাতা, মাদ্রাজ, মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ১৯০৪ সাল পর্যন্ত পরীক্ষা গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ছিল। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারের কোনো বার্ষিক বরাদ্দ ছিল না। ১৮৮২ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৮৮৭ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্যবিদ্যা ও আইন পাঠদান করত বিধায় বার্ষিক ৩০,০০০ রুপি অনুদান পেত। এই তথ্যের আলোকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হল ইউরোপীয় ধাঁচের প্রথম পাঠদানকারী ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়; কলকাতা, মাদ্রাজ কিংবা মুম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় নয় (নিজার, ২০১৮ : ৪৫)।

প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত কয়েক দশকের মধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানের আরও অবনতি হলে ভারতবর্ষের উচ্চশিক্ষা নিয়ে তুমুল সমালোচনা শুরু হয় ভারতে এবং ব্রিটেনে। ভারতে শিক্ষার মান নিয়ে বিদ্বান ইংরেজরা লন্ডনে প্রচারণা শুরু করলে ১৮৮২-৮৩ সালে গঠিত হান্টার কমিশন ভারতের শিক্ষার মানের অবনতি বিষয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালে ভারতের ভাইসরয় হলে তিনি ভারতের শিক্ষা-ব্যবস্থার পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি মনে করতেন, বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট চার্লস উডের (Charles Wood, ১৮০০-১৮৮৫) লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের মডেল[৫] ভারতের জন্য উপযুক্ত নয়। ১৯০৪ সালে তিনি এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনেন। তিনি এমন এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় আইনের পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে মধ্যযুগীয় কাঠামোয় পাঠদানকারী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করেন যখন শুধু জার্মানিতেই নয়, আমেরিকাসহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ এমনকি ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকেও রূপান্তরিত করা হয়েছে গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংস্কার সাধনের পর এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি ও প্রকৌশলবিদ্যা পাঠদান করানোর কথা থাকলেও প্রথম দিকে পাঠদান করা হত কেবল ইউরোপীয় ইতিহাস, দর্শন এবং ইংরেজি সাহিত্য। তৎকালে ভারতবর্ষের অর্থনীতি কৃষি নির্ভর হলেও এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যা পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। এসকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রম অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ-এর

আদলে তৈরি হলেও অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের মত ছিল না। যেমন : বিষয় হিসেবে ইংরেজি সাহিত্য ইংল্যান্ডে পড়ানোর আগে ভারতে পড়ানো শুরু হয়েছে (নিজার, ২০১৮ : ৪৭)। পরবর্তীকালে বিজ্ঞান শিক্ষা শুরু হলেও চাকরি ছাড়া তার অন্য কোন উদ্দেশ্য বা উপযোগিতা ছিল না। ঔপনিবেশিক আমলে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাষ্ট্র গবেষণাবান্ধব ছিল না। উপনিবেশ-উত্তরকালেও এই প্রবণতা সক্রিয় ছিল।

ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ইতিবৃত্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর স্বরূপ পর্যালোচনা করে একথা বলা অত্যুক্তি নয় যে, অল্প কিছু পরিবর্তন ছাড়া, স্বাধীনতাপূর্ব ভারতবর্ষের এবং বাংলাদেশের সকল রাষ্ট্রায়ত্ত বিশ্ববিদ্যালয় এখনও ইউরোপের মধ্যযুগীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কাঠামো অনুসরণ করছে। আমাদের দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক এবং জ্ঞানজাগতিক কাঠামো ঔপনিবেশিক। শুধু তা-ই নয়, এগুলোর পাঠক্রমের-বিষয়বস্তুও ইউরোপ থেকে আমদানিকৃত। ঔপনিবেশিক আমলে ইউরোপীয় শিক্ষা প্রসারের অন্যতম কারণ ছিল দাপ্তরিক কার্য পরিচালনার জন্য ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত জনগোষ্ঠী সৃষ্টি। তাই সেখানে পাঠদান করা হত ইংরেজি সাহিত্য, ইউরোপীয় ইতিহাস এবং দর্শন বিষয়ে। এই শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষে মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপনিবেশের ভিত্তি স্থাপন করেছে। এই শিক্ষা যেহেতু ইউরোপীয় অভিজ্ঞতা এবং ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত, সে কারণে এই শিক্ষা আমাদেরকে এই অঞ্চলের জ্ঞানজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই শিক্ষা দেশীয় সমস্যার সমাধানে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি অনেক ক্ষেত্রে দেশীয় সমস্যাকে দৃষ্টিগোচর হতে দেয়নি। এমন পরিস্থিতি হতে উত্তরণের জন্য দেশীয় প্রেক্ষাপটের উপর ভিত্তি করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জ্ঞানজাগতিক বিউপনিবেশায়ন, প্রশাসনিক কাঠামো ও জ্ঞান-বিষয়ক আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন, সেই সঙ্গে জানা দরকার ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক শর্ত ও বিকাশের ইতিহাস।

আলোকায়নের[৬] (Enlightenment) সার্বিক জ্ঞানকে একমাত্র সত্যরূপে আমাদের কাছে হাজির করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ভারতবর্ষে এই বুলি আউড়িয়েছে যে, ইউরোপ যে ধারা এবং পর্যায়ের মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়েছে তা মানব-সমাজের বিকাশের একমাত্র সত্য এবং সেখানে ইউরোপ উচ্চতর এবং ভারতবর্ষ পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। তাই আমাদের উচিত তাদের অন্ধ অনুকরণ করা। দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত থেকে শুরু করে সাহিত্য, চিত্রকলার মত সৃজনশীল ধারার ক্ষেত্রেও তা সত্য। এরূপ ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার ফলে আমাদের মন ও চিন্তাজগৎও উপনিবেশিত হয়ে যায়। ফলে আমরা আলোকবাদের এই সার্বিক সত্যকে ছেদ করার ক্ষমতা যেমন হারিয়ে ফেলি তেমনি দেশীয় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে আমাদের সমস্যাগুলোর সমাধান করতে ব্যর্থ হই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় :

> আমাদের দেশে বিদেশ-থেকে-পাওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দেশের মনের এরকম সম্মিলন ঘটতে পারে নি। তা ছাড়া ইউরোপীয় বিদ্যাও এখানে বদ্ধজলের মতো, তার চলৎ রূপ আমরা দেখতে পাইনে। যে সকল প্রবীণ মত আসন্ন পরিবর্তনের মুখে, আমাদের সম্মুখে তারা স্থির থাকে ধ্রুবসিদ্ধান্তরূপে। সনাতনত্বমুগ্ধ আমাদের মন তাদের ফুলচন্দন দিয়ে পূজা করে থাকে। ইউরোপীয় বিদ্যাকে আমরা স্থাবর ভাবে পাই এবং তার থেকে বাক্যচয়ন করে আবৃত্তি করাকেই আধুনিক রীতির বৈদগ্ধ্য বলে জানি। এই কারণে তার সম্বন্ধে নতুন চিন্তার সাহস আমাদের থাকে

> না। দেশের জনসাধারণের সমস্ত দুরূহ প্রশ্ন, গুরুতর প্রয়োজন, কঠোর বেদনা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। এখানে দূরের উপলব্ধির দ্বারা নয়। আমরা ছিড়ে ছিড়ে বাক্য মুখস্ত করি এবং সেই টুকরো করা মুখস্থ বিদ্যার পরীক্ষা দিয়ে নিষ্কৃতি পাই। টেক্সটবুক-সংলগ্ন আমাদের মন পরাশ্রিত প্রাণীর মত নিজের খাদ্য নিজে সংগ্রহ করবার নিজের উদ্ভাবন করার শক্তি হারিয়েছে। (রবীন্দ্রনাথ, ১৬ খণ্ড, ২০১২ : ৩২৪)

আক্ষেপ প্রকাশ করে তিনি আরও বলেছেন :

> [...] বিশ্ববিদ্যালয় চিরদিনই বিলেতের আমদানিকৃত টবের গাছ হয়ে থাকবে; সে টব মূল্যবান হতে পারে, অলংকৃত হতে পারে কিন্তু গাছকে সে চিরদিনই পৃথক করে রাখবে ভারতবর্ষের মাটি থেকে; বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শখের জিনিস হবে, প্রাণের জিনিস হবে না। (রবীন্দ্রনাথ, ১৬ খণ্ড, ২০১২ : ৩২৫)

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি যথার্থ। ঔপনিবেশিক আমলে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জ্ঞানগত এবং বৈষয়িক কারণে ইংরেজি ভাষায় ইউরোপীয় শিক্ষা আত্মস্থ করায় তাদের সংস্কৃতিতে ও রুচিতে পরিবর্তন আসতে থাকে। ফলে তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে দেশীয় ও লোকজ ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে। অন্যদিকে, সংস্কৃত ভাষা না জানার কারণে হাজার হাজার বছরের অর্জিত জ্ঞানজগৎ থেকেও তারা বিচ্ছিন্ন হয়। ফলে দেশীয় বিদ্যা-চর্চার ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়, হয় জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচ্ছেদ। এমতাবস্থায় দেশীয় জ্ঞানের ব্যবহারের মাধ্যমে এই অঞ্চলের মানুষের ও রাষ্ট্রের সমস্যা সমাধানে যেমন আমরা ব্যর্থ হই, তেমনি ব্যর্থ হই এই অঞ্চলের ধারাবাহিক জ্ঞান-চর্চার ও জ্ঞানের উন্নয়নে। ফলশ্রুতিতে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো জ্ঞানোৎপাদনে-বন্ধ্যা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দৃশ্যমান আইনি পার্থক্য ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় ও অনার্স কলেজের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য স্পষ্ট হয় না। প্রতিষ্ঠানগুলো পরিণত হয় মনস্তাত্ত্বিক উদ্বাস্তু উৎপাদনের কারখানায়।

চার.

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সচেতনভাবে ঔপনিবেশিক প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে আত্মসত্তার বিচ্ছেদায়ন প্রচেষ্টাই বিউপনিবেশায়ন। এই আত্মসত্তার বিশেষ কোন রূপ নেই। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার মধ্য দিয়ে তা প্রবাহিত হয়। ঔপনিবেশিক আমলে প্রাক্-ঔপনিবেশিক আত্মসত্তার বিভিন্ন ধরন এবং মাত্রায় বিচ্ছেদায়ন হয়েছে। এখন প্রয়োজন বিউপনিবেশায়নের মতো একটি সচেতন ও বিষয়ী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপনিবেশের প্রভাবগুলো চিহ্নিত করে তা কাটিয়ে উঠা। বিউপনিবেশায়ন এবং উত্তর-উপনিবেশবাদ এক নয়। উত্তর-উপনিবেশবাদ-এর মধ্যে বিউপনিবেশায়নের প্রবণতা থাকলেও তা যেমন একমাত্র প্রবণতা নয়, তেমনি একে সার্বিক কোন চরিত্রও বলা যায় না। উপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ার প্রারম্ভিক বিন্দু থেকেই বিউপনিবেশায়ন তৎপরতা শুরু হয়। বিউপনিবেশায়ন মানে দরজা-জানালা বন্ধ করে প্রাক-ঔপনিবেশিক মননে ফিরে যাওয়া নয়। আবার প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তার সাথে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বিউপনিবেশায়ন সম্ভবপর নয়। তবে বিউপনিবেশায়নকে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভাবনাগুলোর সৃষ্টিশীল বৈশ্বিক রূপান্তর বলা যেতে পারে। উপনিবেশের ছাপ এবং বিকৃতিগুলো

চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণ প্রাক-ঔপনিবেশিক চিন্তা-নির্ভর হলেও বিউপনিবেশায়নের অন্য কোন বিশেষ রূপরেখা নেই। বিউপনিবেশায়ন সক্রিয় ব্যক্তি, সমাজ এবং রাজনীতি সাপেক্ষ (নিজার, ২০১৮ : ৫৭)। ফখরুল চৌধুরীর মতে : "বিউপনিবেশায়ন হলো ঔপনিবেশিকতার অবসান এবং উপনিবেশিতদের মুক্তি" (ফখরুল, ২০২১ : ৭৬)। এটা ঔপনিবেশিক প্রভাবসমূহের বিরুদ্ধে অর্থপূর্ণ ও কার্যকর প্রতিশোধ। "বস্তুত এটা পুনরুত্থানের ধারাবাহিক ক্রিয়াকলাপ, যা দেশীয় জ্ঞান, জ্ঞানতত্ত্ব এবং জীবনধারা পুনরুদ্ধার করে" (ফখরুল, ২০২১ : ৭৬)। উপনিবেশের প্রভাবসমূহ যেহেতু আমাদের দেহ-মন-ভূমি-পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ক্রিয়াশীল থাকে তাই বিউপনিবেশায়নের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হলো ঔপনিবেশিক কাঠামোকে উল্টে দিয়ে নিজস্ব দেশীয় কাঠামোর পুনঃস্থাপন ও জনগণকে ঔপনিবেশিক জাঁতাকল থেকে মুক্তি দান।

১৯৫৫ সালে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলোর বাদুং (ইন্দোনেশিয়া) সম্মেলনের পর নাইজেরিয়া ও আলজেরিয়া যথাক্রমে ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে স্বাধীনতা লাভ করলে ক্যারিবীয় অঞ্চলে স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে প্রথম 'বিউপনিবেশায়ন' বা 'Decolonization' শব্দটি ব্যবহৃত হয় (ফখরুল, ২০২১ : ৭৮)। বিউপনিবেশায়ন কোনো একক ব্যক্তির প্রতিরোধ বা মুক্তির সংগ্রাম নয় বরং এটা একটা জাতির প্রতিরোধ ও মুক্তি-সংগ্রাম। বিউপনিবেশায়নের দুটি স্তর– প্রথমস্তরে রয়েছে নিজ ভূখণ্ডে ঔপনিবেশিক দখলদারিত্বের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনতা অর্জন; দ্বিতীয়স্তরে রয়েছে ঔপনিবেশিক শাসনামলে আত্মীকরণের মাধ্যমে দেশের জনগণের চেতনে-অবচেতনে উপনিবেশের যে সব ছাপ-দাগ-প্রভাব রয়ে যায় সেগুলো চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির আলোকে পদক্ষেপগ্রহণ ও বাস্তবায়ন। বিউপনিবেশায়ন শুরু হয় একটি বিশিষ্ট বা ছোট দলের/ঘটনার মাধ্যমে। এর প্রথম তৎপরতা হলো ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা এবং নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির পুনঃঅধ্যয়ন। এই পর্যায়ে ইউরোপীয় সমাজ প্রত্যাখ্যানের ওপর অধিক জোর দেওয়া হয় এবং স্থানীয় যা কিছু ভালো ও ইতিবাচক তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বিউপনিবেশায়নের প্রতিটি স্তর সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের সঙ্গে যুক্ত। এটা পশ্চিমা-ঘরানার কর্পোরেট সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, উপনিবেশকদের নিকট থেকে দেশীয় ভূমিব্যবস্থাপনার অধিকার ও দায়িত্ব বুঝে নেয়, উপনিবেশক দেশগুলোর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত বিভিন্ন হুমকির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। বিউপনিবেশায়ন চলমান ঔপনিবেশিক শিক্ষা, সংস্কৃতি, মিডিয়া, সরকারি নীতিমালা ও জ্ঞানজগতের বিরুদ্ধে পাল্টা লেখার মানসিকতা তৈরি করে। ঔপনিবেশিক শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা কীভাবে উপনিবেশকদের শাসন ও শোষণ কার্যে সহায়তা করে, বিউপনিবেশায়ন সেটাও নির্দেশ করে।

ঔপনিবেশিক শাসন-কাঠামো থেকে বিউপনিবেশায়নের পদক্ষেপ হিসেবে রয়েছে প্রতিপক্ষ শনাক্তকরণ, ঔপনিবেশিক প্রশাসন এবং এর সঙ্গে অঙ্গীভূত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলা তথা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছেদ, স্থানীয় জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জাতীয়-শক্তির আমূল বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, নিজের অস্তিত্বসংলগ্ন সমাজ-বাস্তবতায় ফিরে আসা, উপনিবেশের বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করা, দেশীয় ইতিহাসের নিবিষ্ঠ পাঠের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের মিথ্যা জগৎকে ছুঁড়ে ফেলে দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য

নির্ভর জ্ঞানজগৎ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, ঐতিহাসিক তথ্যের আলোকে উপনিবেশকদের অন্যায্যতার সত্যাসত্য নিরূপণ করা, পারিবারিক সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা, নিজের সংস্কৃতিচর্চায় নিমগ্ন হওয়া, দেশবাসীর মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচারের প্রতি অধিকতর সম্মান ও কদর জাগিয়ে তোলা, দেশের মানুষদের মন, দেহ ও চেতনাকে উপনিবেশ মুক্ত করা, সংস্কৃতি ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম, লড়াকু সংস্কৃতিচেতনা।

ঔপনিবেশিক শক্তি আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে উপনিবেশের জনগণের ওপর প্রাথমিক নিয়ন্ত্রণ আরোপের পর স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপনকল্পে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা অব্যাহতভাবে বিস্তারে সদা সক্রিয় থাকে। উপনিবেশকরা প্রথমে উপনিবেশের ভাষার ওপর হস্তক্ষেপ করে। কারণ তারা জানে, ভাষা শিক্ষা ও সংস্কৃতির বাহন। নিজ ভাষায় মানুষ যেভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে, শিখতে ও বলতে পারে বিভাষায় সেটা পারে না; ভাষার স্বাভাবিকতা নষ্ট হলে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও চিন্তার স্বাভাবিকতা নষ্ট হয়। তাই উপনিবেশকরা উপনিবেশের জনগণের ওপর নিজেদের ভাষা চাপিয়ে দিয়ে সেখানকার জনগণের শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিন্তা ও কল্পনার স্বাভাবিকতা নষ্ট করে চিরস্থায়ী উপনিবেশের পথ প্রশস্ত করতে চায়। কেনিয়ার প্রথিতযশা বিপ্লবী, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, উপনিবেশ-বিরোধী লেখক ও চিন্তক Ngugi Wa Thing'O (১৯৩৮-) তাঁর *Decolonising the Mind : The Politics of Language in African Literature* (১৯৮৬) গ্রন্থে বলেছেন : স্থানীয়দের সমষ্টিগত প্রতিরোধের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ যে বড় অস্ত্রটি প্রয়োগ করে সেটা হলো সাংস্কৃতিক বোমা। আর এই সাংস্কৃতিক বোমার লক্ষ্য হলো মানুষের নিজেদের পরিচয়, নিজেদের ভাষা, নিজেদের বাস্তুতন্ত্র, নিজেদের সংগ্রামের ইতিহাস, নিজেদের ঐক্য, নিজেদের ক্ষমতা, এবং সর্বোপরি খোদ নিজেদের ওপর থেকেই বিশ্বাস নষ্ট করে দেয়া। উপনিবেশ স্থাপনকারীরা যেখানেই গেছে সেখানেই সংস্কৃতি হয় বিকৃত নয়তো বিস্মৃত করেছে। উপনিবেশের আত্মীকরণ ধাপে উপনিবেশকের সংস্কৃতি সুকৌশলে অধিগত দেশের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেয়ার কসরত হয়েছে (উদ্ধৃত, ফখরুল, ২০২১ : ৭৬)। গ্রন্থটিতে তিনি মনের বিউপনিবেশায়নের কথাও বলেছেন। কারণ তিনি মনে করেন : একজন ব্যক্তির কিংবা একটা জাতির মননে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারলে ঐ জাতিকে একটা অন্তহীন দাসত্বে আটকে রাখা যায়। মনজাগতিক উপনিবেশ স্থাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি মাধ্যম শিক্ষা। একটা জাতির শিক্ষাব্যবস্থা কলোনাইজড হলে, ঐ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মনও উপনিবেশিত হবে। তিনি একারণে মনের বিউপনিবেশায়ন চেয়েছেন। উপনিবেশকদের প্রবণতা সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুনতাসীর মামুন বলেছেন : "কলোনীর একটি মূল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় উপনিবেশে বসবাসকারী অধস্তনদের মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করা" (মুনতাসীর, ২০১৫ : ১৪)। কারণ, ঔপনিবেশিক শাসকেরা জানে যে, "মানুষের সত্তার অদৃশ্য সম্পদ মনন জগৎকে করায়ত্ত" (মহীবুল, ২০০৭ : ১১) করতে না পারলে অর্থাৎ "মনোজগতে আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে লক্ষ্য অর্জন করা যাবে না" (মুনতাসীর, ২০১৫ : ১৪)। এজন্য তারা "ভাবনার জগতে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াস" (মুনতাসীর, ২০১৫ : ১৩) চালানোর পথে পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমে উপনিবেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে কলোনাইজড করতে চায়। উপনিবেশে তারা নিজেদেরকে উপস্থাপন করে "বিজয়ী, গবর্নর, স্বার্থান্বেষী, পুরোনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে" (মুনতাসীর, ২০১৫ : ১০)। উপনিবেশকে তারা গণ্য করে 'নতুন দেশ' বা 'নিউ কান্ট্রি' হিসেবে। এর পাশাপাশি, ঔপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশে

সবসময় দুটি কাজ করে থাকে : ক. লোকের অভিবাসন (Emigration) ও নতুন দেশ দখল (Occupation); খ. নতুন দেশের সরকারব্যবস্থা বা ঐ দেশের মানুষদেরকে দীর্ঘকাল অধস্তন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে রাখার কৌশল গ্রহণ। দেশের জনগোষ্ঠীকে অধস্তন করে রাখার সর্বোত্তম উপায় ঐদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় উপনিবেশ স্থাপন।

উপনিবেশ-বিরোধী চিন্তক Frantz Fanon (১৯২৫-১৯৬১) মনে করেন : সংস্কৃতি উপনিবেশ-বিরোধী প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় সংস্কৃতি বিউপনিবেশায়নের একটি প্রধান মাধ্যম। সংস্কৃতি একাধারে আমাদের অতীত পরম্পরা এবং পৃথিবী দেখার নিজস্ব চিন্তার মধ্যকার যোগসূত্র। এটা আমাদের আত্মপরিচয়ের সারাংশ এবং ঔপনিবেশিক ভাবাদর্শ মোকাবেলার প্রধান হাতিয়ার। ঔপনিবেশিক চাপে এটা কখনো দুমড়ে, মুচড়ে বিকৃত হলেও বিস্মৃত বা মুছে যায় না। প্রতিনিয়ত লড়াই ও জনগণের জীবনাচরণের মধ্য থেকে যে সংস্কৃতি অবয়বপ্রাপ্ত হয় – সেটাই ঔ জাতির নিজস্ব সংস্কৃতি। সংস্কৃতি সাধনা ও চর্চার বিষয়– চাপিয়ে দেওয়ার নয় (Fanon, 2005 : 237)। শিক্ষা যেহেতু সংস্কৃতির অন্যতম একটি অঙ্গ সেহেতু বিউপনিবেশায়ন প্রক্রিয়ায় শিক্ষার রয়েছে একটি বড় ভূমিকা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাচিন্তা প্রত্যয়দ্বয় দ্বারা আমরা বলতে চেয়েছি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিউপনিবেশায়নের কথা এবং দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ঔপনিবেশিক প্রভাবগুলোকে সুস্পষ্টভাবে শনাক্ত করে ও তার খারাপ দিকটিকে বর্জন করে দেশীয় উপাদান নির্ভর সমাধানের ব্যবস্থা করা।

বিঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে আমাদের দেশীয় শিক্ষা ও জ্ঞানজগতকে বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করলে আমরা দেখতে পাই, ঔপনিবেশিক প্রভাবে পশ্চিমা জ্ঞানজগৎকে সার্বিক সত্য অর্থাৎ একমাত্র সত্য ভাবার কারণে আমরা নতুন জ্ঞান উৎপাদনের মানসিক ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে প্রাক-ঔপনিবেশিক জ্ঞানজগৎ থেকে। ফলে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠছে পশ্চিমাগত একটি স্থবির জ্ঞানজগতের শিক্ষা ও প্রসার কেন্দ্র, যে জ্ঞানের উদ্ভব ও বিকাশের প্রেক্ষাপটের সাথে আমাদের কোন মিল নেই। আমাদের লোকসংস্কৃতি এবং জীবন-সমস্যা থেকে এগুলো বিচ্ছিন্ন। ঐসকল জ্ঞানের উদ্ভবের ইতিবৃত্ত আমাদের কাছে অপরিচিত। ফলে ওগুলোকে ব্যবহার করে আমাদের জ্ঞান উৎপাদনের ও আত্মবিকাশের পরিসর থাকে না। এগুলো হয়ে ওঠে শুধু আচার সর্বস্ব মাত্র।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, প্রাচীন কাল থেকে এই অঞ্চলে অনেক জগৎ বিখ্যাত দার্শনিক, যুক্তিবিদ, গণিতবিদ এবং জ্যোতির্বিদের আবির্ভাব ঘটলেও উনিশ শতকের পর থেকে তেমন আর দেখা যায় না কেন? এর সম্ভব্য কারণ হতে পারে : ক. প্রাক্-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে প্রচল ভাষাসমূহ যেমন সংস্কৃত, আরবি, ফারসি, হিন্দি ও উর্দুকে বাদ দিয়ে দাপ্তরিক-ভাষা হিসেবে ইংরেজিকে গ্রহণ; খ. ঔপনিবেশিক শাসনামলের একটা বৃহৎ অংশ ধরে প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য সরকারি কোন সহায়তা না থাকা; গ. ঔপনিবেশিক শিক্ষার প্রভাবে প্রাক্-ঔপনিবেশিক জ্ঞানজগৎ থেকে বিচ্ছেদ; ঘ. জ্ঞানের চরিত্র বিষয়ে আমাদের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি; ঙ. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যকার ভাষা ও ধর্মগত পার্থক্য। এসকল কারণের পাশাপাশি ইংরেজি সাহিত্য, ইউরোপীয় দর্শন ও ইতিহাসের পাঠগ্রহণের মধ্যদিয়ে আমাদের বৌদ্ধিক জগতে জ্ঞানের নতুন পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। ফলে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রাক-ঔপনিবেশিক জ্ঞানজগৎ

থেকে। তা ছাড়া পাশ্চাত্য জ্ঞানজগৎকে শুধু বৈশ্বিক নয়, সার্বিক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে আমাদের সামনে। সে কারণে ঔপনিবেশিক আমলে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হয়ে উঠছে পশ্চিম থেকে আসা সার্বিক নামের একটি স্থবির জ্ঞানজগতের শিক্ষা ও প্রসার কেন্দ্র। তা ছাড়া আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে যেটুকু গবেষণা হয়, তা অনেকাংশে পাশ্চাত্য জ্ঞানের ইতিহাস, ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা তৎপরতা গবেষককে কেবল স্বদেশি জন-মানুষ থেকে বিচ্ছিন্নই করেনি, অনেক সময় এ ধরনের গবেষণা আমাদের মনোজগতে বাস্তবতার ভ্রমও তৈরি করেছে। যে কারণে পারিপার্শ্বিক অনেক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-সামাজিকসহ অপরাপর জ্ঞানগত এবং ব্যবহারিক সমস্যা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না।

পাঁচ.

ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত অর্থাৎ বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের যে রূপরেখা প্রয়োজন তা পাওয়া যেতে পারে প্রাক-ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের তথা বাংলার মহাবিহারগুলোতে। উপনিবেশপূর্ব-কালে এদেশে যে, দেশীয় জ্ঞান-চর্চা ও জ্ঞান উৎপাদনের সংস্কৃতি ছিল প্রাচীন ভারতীয় মহাবিহারগুলো এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের এ অঞ্চলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক বিকাশ ঘটিয়েছিল এই সকল মহাবিহার। পৃথিবীর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে নালন্দা। আনুমানিক চতুর্থ শতকের দিকে বর্তমান ভারতের বিহার রাজ্যের অন্তর্গত মগধে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে আনুমানিক অষ্টম শতকের দিকে বিক্রমশীলা, সোমপুর এবং ওদন্তপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা করেন রাজা ধর্মপাল। সোমপুর বিহার বর্তমান বাংলাদেশের পাহাড়পুরে অবস্থিত। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সবচেয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙের ভ্রমণ কাহিনিতে এবং তিব্বতীয় সূত্র সাহিত্য থেকে। ধারণা করা হয়ে থাকে, আনুমানিক সপ্তম শতকের দিকে নালন্দা উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে। সে সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই হাজার শিক্ষক এবং দশ হাজার শিক্ষার্থী ছিল। যদিও হিউয়েন সাঙের অবস্থানকালে সেখানে ছয় হাজার শিক্ষার্থী ছিল। তাদের অনেকে কোরিয়া, জাপান, চীন, তিব্বত, ইন্দোনেশিয়া, ইরান এবং তুরস্ক থেকে আগত। সে সময় নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিল বিশালাকার তিনটি গ্রন্থাগার – রত্নসাগর, রত্নদধি এবং রত্নরঞ্জক। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, রত্নদধি নয় তলা ছিল। শিক্ষক-ছাত্রদের জন্য আবাসন ব্যবস্থা ছাড়াও প্রায় একশো শ্রেণিকক্ষ ছিল। সোমপুর, বিক্রমশীলা এবং ওদন্তপুরী মহাবিহার দশম এবং একাদশ শতকের দিকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত অবস্থায় না থাকলেও[৭] সেখানে প্রায় ছয় থেকে আট হাজারের মতো শিক্ষার্থী ছিল এবং তাদের অনেকেই বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিল।

ভারতবর্ষের তথা বাংলার এই সকল প্রাচীন মহাবিহারগুলো ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় না হলেও এগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয় বলা যায়। কারণ, এখানে অনেক দেশ থেকে শিক্ষার্থীদের আগমন ঘটেছিল এবং এগুলোর ভাবনা, জ্ঞান-চর্চা এবং উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আজকে আমরা যা বুঝি তার মতোই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে :

> এই য়ুনিভর্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা বিক্রমশিলা তক্ষশিলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কালনির্ণয় এখনো হয় নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, য়ুরোপীয় য়ুনিভর্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব। তাদের উদ্ভব

> ভারতীয় চিত্তের আন্তরিক প্রেরণায়, স্বভাবের অনিবার্য আবেগে। তার পূর্ববর্তীকালে বিদ্যার সাধনা ও শিক্ষা বিচিত্র আকারে ও বিবিধ প্রণালীতে দেশে নানা স্থানে ব্যাপ্ত হয়েছিল, এ কথা সুনিশ্চিত। (রবীন্দ্রনাথ ১৬ খণ্ড, ২০১২: ৩১৮)

মহাবিহারগুলোর আকার ছিল ইউরোপীয় ঘরানার বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় বৃহৎ। কুলীন ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে না হয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক বৌদ্ধদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এগুলোতে মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর চেয়েও বেশি জ্ঞানতাত্ত্বিক স্বাধীনতা ছিল। ফলে এখানকার শিক্ষার্থীদের দ্বারা ভারত-ইতিহাসের সর্বাধিক সংখ্যক সূত্রসাহিত্য রচিত হয়েছিল। এ সকল সূত্রে প্রচল বিভিন্ন তত্ত্বের সমস্যাগুলো আলোচিত হয়েছে। তবে মহাবিহারগুলোর পাঠক্রম কোন বিশেষ তত্ত্ব এবং ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত ছিল না। হিউয়েন সাঙ এবং তিব্বতীয় সূত্র থেকে জানা যায়, নালন্দায় বেদ, যুক্তিশাস্ত্র, ব্যাকরণ, আয়ুর্বেদ, গণিত, সঙ্গীত, নৃত্য, শিল্পকলাসহ ব্যবহারিক অনেক জ্ঞানের পাঠ এবং উৎকর্ষ সাধন করা হয়। অনেক তত্ত্বের উন্নয়ন করেছেন সেই সময়ের আচার্যগণ। তাদের প্রবর্তিত তত্ত্বসমূহ ভারতবর্ষসহ বিভিন্ন দেশে আজও পঠিত হয়। বিহারগুলোতে মেধার ভিত্তিতে সকলের জ্ঞানের অধিকার ছিল। জ্ঞানচর্চায় বিশেষ কোন বর্ণ, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক শ্রেণি ছিল না। সে কারণে মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংখ্যা যেখানে হাজার অতিক্রম করত না, সেখানে এই সকল বিহারের শিক্ষার্থী সংখ্যা আট-দশ হাজারেও পৌঁছেছে। তাই, দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় এই মহাবিহারগুলো ছিল পাশ্চাত্য তথা ঔপনিবেশিক প্রভাববর্জিত দেশীয় ঘরানার বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই অর্থে বাংলাদেশের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সোমপুর বিহার।

ছয়.

জ্ঞান বিষয়ক বিদ্যমান পশ্চিমমুখী দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিহার্য শর্ত। তবে শুধু জ্ঞান বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করলেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাণ সঞ্চালন হবে এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আমাদের সমস্যা সমাধানের মধ্য দিয়ে বৈশ্বিক জ্ঞানকাণ্ডে অবদান রাখবে তা নয়। এর সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাভিত্তিক বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাব বা রূপরেখা। জ্ঞান বিষয়ক বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখাভিত্তিক বিউপনিবেশায়ন প্রস্তাবগুলো বিবেচনায় নিলে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বৈশ্বিক জ্ঞানকাণ্ডে অবদান রাখবে বলে আমাদের বিশ্বাস। এ ক্ষেত্রে বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়কে কমপক্ষে দুটি শর্ত পূরণ করতে হবে। ক. জ্ঞানতাত্ত্বিক : বিশ্ববিদ্যালয় নিবিড় জ্ঞানজগতের নির্মাণ, চর্চা ও প্রচার করবে; খ. আইনি : বিশ্ববিদ্যালয় যে নিবিড় জ্ঞানজগৎ নির্মাণ করবে এবং গবেষণার মাধ্যমে যে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করবে, তা রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে গেলেও তা প্রকাশযোগ্য হবে। বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞান-চর্চার অধিকার থাকবে সর্বজনের। জ্ঞান-চর্চায় দেশ-কাল-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গগত কোনো বৈষম্য বা প্রতিবন্ধকতা থাকবে না। সার্বিক জ্ঞানের নামে পশ্চিমা জ্ঞানের শিক্ষার পরিবর্তে বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশীয় জ্ঞানের এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বহুত্ববাদের চর্চা হবে। যেহেতু সার্বিক জ্ঞান বলে কিছু নেই, ফলে তা পাঠ ও আত্মস্থ করার প্রয়োজন নেই। তাই শিক্ষার্থীর মূল উদ্দেশ্য হবে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানের সঙ্কট চিহ্নিতকরণ এবং তার সমাধানকল্পে নতুন জ্ঞান সৃষ্টিতে অভিনিবেশ। বিষয়ভিত্তিক বা বিভাগভিত্তিক জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে

জ্ঞানার্জনের পদ্ধতিভিত্তিক ব্যবস্থা চালুর মধ্য দিয়ে জ্ঞানসৃষ্টি, চর্চা ও বিতরণের নতুন পরিসর তৈরি করতে হবে। আঞ্চলিক এবং জাতীয় বিষয়ে জ্ঞানজগৎ নির্মাণের মধ্য দিয়ে জ্ঞানের বৈশ্বিক রূপ তৈরি করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিষ্ঠা, সাধনা, কঠোর শ্রম এবং অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান তৈরির একটা ধারা প্রবর্তন করতে হবে যেখানে তাদের মধ্যকার নতুন সম্পর্ক হবে জ্ঞানের উত্তর-সাধক এবং পূর্ব সাধকের সম্পর্ক।

সাত.

বিউপনিবেশিত বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাচিন্তার আলোকে কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনার স্বরূপ অন্বেষণের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষা সম্পর্কে তিনি গভীর দার্শনিক বোধের অধিকারী ছিলেন না। তাঁর নিকট থেকে সেটা প্রত্যাশিতও ছিল না। জামরুল হাসান বেগ এর মতে : "শিক্ষা বিষয়ক চিন্তায় নিজেকে সর্বতোভাবে সম্পৃক্ত করার বয়স, সুযোগ ও মানসিকতা – কোনোটিই তাঁর অনুকূলে ছিল না" (বিশ্বজিৎ, প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ৩২২)। তবে এটা ঠিক যে, বিষয়টিকে তিনি হৃদয় দিয়ে ভাবতেন। সাহিত্যক্ষেত্রে স্থিতিকালের স্বল্পতা এবং বয়সের স্বভাবধর্ম তাঁকে তাঁর প্রবন্ধসমূহের বিষয় সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করার অবসর দেয়নি। ফলে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক হিসেবে তাঁর পরিচিতি সীমিত হয়ে পড়েছে। অপরদিকে স্বভাবধর্মের কারণে উপনিবেশিত স্বদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। তাৎক্ষণিকভাবে তিনি সমস্যা চিহ্নিত করে বিশ্লেষণ ও সমাধানের পথনির্দেশ করেছেন (বিশ্বজিৎ, প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ৩২২)। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা স্বল্প, তবে সেখানে প্রকাশিত ভাবনাগুলো একান্তই তাঁর নিজস্ব। মূলত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কিংবা অভিভাষণ রচনার উদ্দেশ্যেই তাঁর প্রবন্ধসমূহ রচিত। ফলে প্রবন্ধসমূহে সমসাময়িক বিষয়, চিন্তা, আবেগ ও উপলব্ধির উপস্থিতিই স্বাভাবিক। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য সমালোচকের মন্তব্য :

> বিশুদ্ধ নান্দনিক প্রযত্নে নয়, নজরুল প্রবন্ধ লিখেছেন প্রধানত দেশকাল পরিবেশ ও কর্মজগতের প্রণোদনায়। পরাধীন দেশের যন্ত্রণা, স্বসমাজ ও প্রতিবেশী হিন্দুসমাজের পারস্পরিক সহাবস্থান সত্ত্বেও উপজাত সমস্যা-সংঘাত, ধনবান-ধনহীনের বৈষম্য, অশিক্ষা-কুসংস্কারের প্রবল পীড়ন এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের অপমান ও লাঞ্ছনা তাঁর সত্যসন্ধ স্পর্শকাতর হৃদয়ে যে তীব্র আলোড়ন তুলেছিল প্রবন্ধসমূহে তার স্বতঃস্ফূর্ত ও আবেগময় বহিঃপ্রকাশ লক্ষণীয়। এ সমস্ত প্রবন্ধের অধিকাংশ সম্পাদকীয় তাগিদে লেখা, কিছু কিছু আবার বিভিন্ন সভায় প্রদত্ত অভিভাষণ আকারে প্রাপ্ত, ফলত সুপরিকল্পিত প্রবন্ধের প্রস্তুতি ও পরিশীলন এখানে পাওয়া যায় না। তথাপি অবশ্যম্ভাবী রূপে তা স্বদেশ ও স্বকালস্পর্শী। (বিশ্বজিৎ, প্রথম খণ্ড, ২০১৭ : ২০০)

উপনিবেশোত্তরকালে আমরা আজ যা অনুভব করছি, কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর কালেই জাতীয় উন্নয়নের জন্য ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। বিউপনিবেশিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে কাজী নজরুল ইসলাম-এর শিক্ষাভাবনার স্বরূপ নির্দেশের পূর্বে তাঁর শিক্ষাজীবন ও সেই সময়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিররণ উপস্থাপন আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

CamScanner

আট.

কাজী নজরুল ইসলাম জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত জামুরিয়া থানার চুরুলিয়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম কাজী ফকির আহমদ। নজরুল ইসলামের 'পিতৃপুরুষের বাস ছিল পাটনায়' (তাহা ইয়াসিন, ২০১৩ : ৭৩)। শৈশবে পিতার কাছেই তাঁর লেখাপড়ায় হাতে-খড়ি হয়। ১৯০৮ সালে পিতার মৃত্যুর পর আর্থিক অনটনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তাঁর জীবন-সংগ্রাম। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-দীক্ষায় বিকশিত হওয়ার সব পথ রুদ্ধ হলে তিনি ১৯০৯ সালে গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাইমারি পাশ করে মক্তবে শিক্ষকতা ও মাজারের খাদেম হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। গোলাম মুরশিদ-এর মতে : "পিতার মৃত্যুর বছর দুই পরে তিনি মক্তবের লেখাপড়া শেষ করেন এবং সর্দার পোড়ো হয়ে অন্য ছাত্রদের লেখাপড়া শেখানোর কাজে সহায়তা করেন" (মুরশিদ, ২০১৮ : ২১)। এসময় তিনি লেটো গানের দলে যোগদান ও দলের জন্য পালাগান রচনা শুরু করেন। তাঁর চাচা বজলে করিম ছিলেন সংস্কৃতিমনা এবং তিনি আরবি ও ফারসি ভাষা জানতেন। নজরুল ইসলাম স্বীয় পিতৃব্যের নিকট আরবি ও ফারসি ভাষা-শিক্ষা লাভ করেন। আবদুল কাদিরের মতে : "এই পিতৃব্যের কাছেই নজরুলের ফারসি শিক্ষার হাতেখড়ি হয় এবং তাঁর প্রভাবেই নজরুল বাল্য বয়সে উর্দু-ফারসি মিশ্রিত বাংলায় পদ্য রচনা শুরু করেন" (কাদির, ১৯৮৯ : ৩)। এই চাচার উৎসাহেই তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন। রফিকুল ইসলাম এর মতে : "[...] তাঁর বাবার চাচাতো ভাই কাজী বজলে করিমের ফারসি জ্ঞান, কবিতায় উৎসাহ এবং সাহচর্য নজরুলকে ছেলেবেলা থেকেই উর্দু-ফারসী শব্দপ্রধান বাংলা পদ্য রচনায় অনুপ্রাণিত করে" (রফিকুল, ১৯৯৭ : ৯)। ১৯১১ সালে তিনি বর্ধমান জেলার লাঙ্গলকোট থানার অজয় নদ তীরবর্তী মাথ্রুন গ্রামে নবীনচন্দ্র ইন্সটিটিউটে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। স্কুলটি ছিল কাসিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী'র। তিনি এসময় নজরুল ইসলামের পড়াশুনায় আর্থিকভাবে সহায়তা করেছিলেন। তখন স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন কুমুদরঞ্জন মল্লিক। সুন্দর ও লাজুক চেহারা, অসীম সাহস, মার্জিত ব্যবহার ও কথা দিয়ে নজরুল ইসলাম প্রধান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন (আজহার, ১৩৬৫ : ৭)। স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়নের পর অর্থাভাব ও স্কুলের বাঁধাধরা বদ্ধ জীবনে তিনি অস্থির হয়ে ওঠেন। তাঁর স্বাধীনতাকামী চঞ্চল মন নীরস পঠন-পাঠনের সাথে খাপ খাওয়াতে না পারলে ১৯১২ সালে সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার আগেই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন এবং বাসুদেবের কবিগানের দলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেন। এসময় তাঁর পরিচয় হয় বর্ধমানের অন্ডাল ব্রাঞ্চ রেলওয়ের এক খ্রিষ্টান গার্ডের সাথে। গার্ড তাঁকে প্রতিদিন টিফিন ক্যারিয়ারে করে গার্ডের বাসা থেকে স্টেশনে খাবার নিয়ে আনার চাকরি দেন। গার্ডের বাসায় কিছুদিন অবস্থান শেষে তিনি আসানসোল চলে আসেন এবং এম. এ বখশের চা-রুটির দোকানে চাকরি নেন। সুশীল ভট্টাচার্য বলেছেন :

> যে বয়সে অন্য ছেলেরা বিদ্যালয়ে গিয়ে নিয়মিত পড়াশোনা করছে, খেলার মাঠে শরীচর্চা করছে, গান-বাজনার অনুশীলন করছে, সেই বয়সে নিজের পেটের চিন্তায়, নিজের উদর পূর্তির জন্য কি এক অজ্ঞাত কারণে এই সময় নজরুল একদিন কাউকে কিছু না বলে আসানসোল শহরে চলে এসেছিলেন। (সুশীল, ২০১২ : ৩৬)

সেখানে তাঁর মাসিক বেতন ছিল এক টাকা সঙ্গে তিন বেলা আহার কিন্তু থাকার জায়গা পাবে না।

এসময় তিনি রাত্রি যাপন করতেন দোকান সংলগ্ন তিনতলা বাড়ির সিঁড়ির নীচে। ঐ বাড়ির মালিক ছিলেন আসানসোলের পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহ। এসময় রফিজউল্লাহর সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে। নিঃসন্তান কাজী রফিজউল্লাহর নিকট তিনি পুত্রস্নেহ লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি কাজী রফিজউল্লাহর সহায়তায় ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশালের কাজীরসিমলা ও দরিরামপুর গমন করেন এবং দরিরামপুর স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। তিনি সেখানে জায়গীর হিসেবে হামিদউল্লাহ নামের একজনের বাড়িতে থাকতেন। হামিদউল্লাহ ছিলেন খুবই রক্ষণশীল মুসলিম। বাড়ির কঠোর মুসলিম বিধি-নিষেধের কারণে নজরুল ইসলামের গান গাওয়া ও সাহিত্য-চর্চা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে তিনি হামিদউল্লাহ'র বাড়ি ত্যাগ করেন এবং স্থান নেন বিচুরিয়া বেপারীর বাড়িতে। তখন দরিরামপুর স্কুলে সাপ্তাহিক রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় তিনি স্বীয় মেধা ও প্রতিভার দ্বারা শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি প্রথম মতান্তরে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হন। এখানেও স্কুলের গণ্ডি তাঁর অসহ্য হয়ে উঠলে বার্ষিক পরীক্ষার আগেই তিনি কাউকে কিছু না বলে ময়মনসিংহ ত্যাগ করে বর্ধমানে ফিরে আসেন। তিনি ১৯১৫ সালে ভর্তি হন বর্ধমানের সিয়ার সোল রাজ হাই স্কুলে। এখানে তিনি অষ্টম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। সিয়ার সোল রাজ হাই স্কুল ছিল তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষ প্রতিষ্ঠান। এই স্কুলে অধ্যয়ন কালেই তিনি মৌলভী হাফিজ নুরুন্নবীর কাছে ফারসি শেখেন। এখান থেকেই তিনি প্রি-টেস্ট পরীক্ষা দেন। সে সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদানের জন্য সেনাবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি শুরু হলে তিনি মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা না দিয়েই ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪৯নং বাঙালি প্লাটুনে যোগদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তিনি ব্যাটালিয়ন কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার পদ লাভ করেন। সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ কালেই তিনি রুশ বিপ্লব ও মার্কসীয় দর্শনের সাথে পরিচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে ৪৯নং বাঙালি প্লাটুন ভেঙে দেওয়া হলে তিনি কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণ তাঁর আর হয়ে ওঠেনি।

নয়.

কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনা সম্পর্কিত অধিকাংশ প্রবন্ধই প্রকাশিত হয়েছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে সংঘটিত অসহযোগ[৮]-খিলাফত[৯] আন্দোলনের পটভূমিতে। তবে এই শিক্ষা দর্শনের মূল প্রোথিত রয়েছে বঙ্গভঙ্গ[১০] পরবর্তী স্বদেশি আন্দোলন[১১] কালে। তাঁর শিক্ষা দর্শনের মূলসূত্র অন্বেষণের সুবিধার্থে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

স্বদেশি আন্দোলন শিক্ষা, রাজনীতি ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করলে কতিপয় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে ইংরেজির পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্রগঠন, মানসিক শক্তির বিকাশ, জাতীয় ইতিহাস, সাহিত্য, দর্শন ও দেশীয় অর্থনীতি সম্পর্কে জ্ঞানদান ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের মধ্যে সমন্বয় সাধনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বল্পকালের মধ্যেই এই জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন সমগ্র ভারতে বিস্তার লাভ করে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতীয় শিক্ষার প্রসার ঘটতে থাকে। ১৯০৬ সালের ১৪ই আগস্ট রাসবিহারী ঘোষ এর সভাপতিত্বে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council

of education) ও Society for the Promotion of Technical Education (S.P.T.E) গঠিত হয়। এই পরিষদদ্বয় মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও প্রকৌশল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সুপারিশ করে এবং কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। প্রতিষ্ঠান দুটি পৃথক হলেও উভয়ের উদ্দেশ্য ছিল একই; তা হল ঔপনিবেশিক শক্তির বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে এসে মাতৃভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানচর্চা। শিক্ষাক্ষেত্রে এ জাতীয় ভাবনা ছিল স্পষ্টতই পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে আত্মনির্ভরতা অর্জনের পথে দৃপ্ত পদক্ষেপ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের মোট প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ চারটি। প্রকাশিত এই চারটি প্রবন্ধগ্রন্থের প্রবন্ধসহ বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় তাঁর যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, সব মিলিয়ে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮৫টির অধিক। এছাড়া রয়েছে 'রাজবন্দীর জবানবন্দি'[১২] নামে একটি ভাষণ, ২২টি অভিভাষণ, ০৯টির অধিক ভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা। তাঁর প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধগ্রন্থ *যুগ-বাণী* (১৯২২)[১৩]। তাঁর প্রকাশিত অপর প্রবন্ধগ্রন্থ তিনটি হলো : *দুর্দিনের যাত্রী* (১৬২৬)[১৪], *রুদ্রমঙ্গল* (১৯২৭)[১৫] ও *ধূমকেতু* (১৯৬১)। *যুগ-বাণী* প্রবন্ধ-গ্রন্থে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা একুশ। গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধসমূহ বিষয় ও বক্তব্যবিচারে সমকালের জীবন-প্রতিবেশের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে শাশ্বত আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের 'জাতীয় শিক্ষা', 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' ও 'সত্য শিক্ষা' প্রবন্ধে নজরুলের শিক্ষাচিন্তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। এর পাশাপাশি তাঁর এসব চিন্তার বাস্তব পরিসমাপ্তি ঘটেছে– ঔপনিবেশিক প্রভাবমুক্ত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষ পত্তনের মধ্য দিয়ে।

এগারো.

কাজী নজরুল ইসলাম একটি উপনিবেশিত দেশের অধিবাসী হয়েও আদ্যোপান্ত ছিলেন উপনিবেশ বিরোধী। অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনের বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি উপনিবেশমুক্ত স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে বিদেশি পণ্য ও বিদেশিদের সঙ্গ পরিত্যাগ করার যে পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল, তার প্রতি নজরুল ইসলামের সমর্থন থাকলেও আন্দোলনের সামগ্রিক কর্মসূচির প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল না। এসময়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে সরকারের একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের গণ্ডিমুক্ত করার প্রয়াস ছিল। তিনি স্বাভাবিকভাবেই এ বিষয়টিকে উপেক্ষা করতে পারেননি। তবে বিজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবকে কাটিয়ে জাতীয় বিশেষত্ববহুল শিক্ষা ও সংস্কৃতি-চর্চার পথ উন্মুক্তকরণে তাঁর চিন্তা ও সর্বাত্মক প্রয়াস কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রচলিত বিজাতীয় পাঠক্রম বর্জন করে, জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এদেশীয় জীবন-পদ্ধতি এবং সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পৃক্ত পাঠদান কর্মসূচির প্রতিই তাঁর সমর্থন ছিল। সরকারি বিদ্যালয়ের পরিবর্তে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করেছেন। আর এর সফল বাস্তবায়নের জন্য জনমানুষের সর্বাত্মক ও সম্মিলিত সহযোগিতা এবং সহমর্মিতা তাঁর একান্ত কাম্য ছিল। কেবল ঝোঁকের বশে, উদ্দেশ্যবিহীন ও বিশেষত্বহীন প্রতিষ্ঠান গঠনের বিরুদ্ধে ছিল তাঁর অবস্থান। তাঁর ভাষায় :

> আজ ইংরেজের সহযোগিতা বর্জন করিতেছি বলিয়াই যে রাগের মাথায় যেন-তেন প্রকারের দু-একটা ঠাটকবাজী-গোছ জাতীয় স্কুল কলেজ দাঁড় করাইয়া সরিয়া পড়িতে হইবে, তাহা নয়; অসহযোগিতার মৌসুম না আসিলেও জাতীয়তার দিক দিয়া আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়ের

> প্রতিষ্ঠা অনেক আগেই হওয়া উচিত ছিল। বিজাতীয় অনুকরণে আমরা ক্রমেই আমাদের জাতীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিতেছি। অধিকাংশ স্থলেই আমাদের এই অন্ধ অনুকরণ হাস্যাস্পদ 'হনুকরণে' পরিণত হইয়া পড়িতেছে। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২১)

– আসলে স্বদেশি ও অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দেশে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যে উদ্যোগ গৃহীত হয়, তাতে নজরুল ইসলাম সর্বৈব সমর্থন প্রদান করেননি। কারণ, তিনি মনে করতেন, শুধু আন্দোলনের সমর্থনে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ অদূরদর্শিতার পরিচায়ক। জাতীয় জীবনের প্রয়োজনে অনেক আগেই এ ধরনের উদ্যোগ গৃহীত হওয়া উচিত ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, কেবল আন্দোলনের প্রয়োজনে ঔপনিবেশিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিজাতীয় শিক্ষা গ্রহণের বিরুদ্ধে সাময়িক আন্দোলন না করে দেশ ও জাতিকে দীর্ঘমেয়াদে ঔপনিবেশিক শক্তির কবল থেকে মুক্ত রাখার জন্য ও ঔপনিবেশিক চিন্তা-ভাবনা-দৃষ্টিভঙ্গি-রুচি'র প্রভাবমুক্ত জাতি গড়ে তোলার জন্য আমাদের এই আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উচিত। তাঁর এ জাতীয় চিন্তাভাবনা অবশ্যই দূরদৃষ্টির পরিচায়ক।

কাজী নজরুল ইসলাম মনে করেন, দেশীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সৃষ্টিশীলতা-চর্চার পরিবর্তে বিজাতীয়-বিদ্যার অন্ধ অনুকরণে এবং তা থেকে লব্ধজ্ঞান দেশীয় ঐতিহ্যকে অপসারিত করে এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে ব্যক্তির রুচি-পছন্দ ও মানসিকতার যোগ সৃষ্টিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। ভালো-মন্দ বিবেচনা না করে বিজাতীয় শিক্ষাকে গ্রহণ করা, নিজস্ব শিক্ষার চিরায়ত ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার শামিল। আর এজাতীয় শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, মনুষ্যত্ব ও মনীষারই চরম অবমাননা। নজরুল বলেছেন :

> পরের সমস্ত ভালো-মন্দকে ভালো বলিয়া মানিয়া লওয়ায়, আত্মা, নিজের শক্তি ও জাতীয় সত্যকে নেহায়েৎ খর্ব করা যায়। নিজের শক্তি, স্বজাতির বিশেষত্ব হারানো মনুষ্যত্বের মস্ত অবমাননা। স্বদেশের মাঝেই বিশ্বকে পাইতে হইবে, সীমার মাঝেই অসীমের সুর বাজাইতে হইবে। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২১)

তাই এই পাশ্চাত্য-প্রভাব বর্জনের দিনে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের কালে নজরুল ইসলামের প্রত্যাশা শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কেবল বাহিরে না হয়ে অন্তরেও যেন হয়। আজকের কিশোর ও তরুণ দল – যারা এদেশের আগামীদিনের কর্ণধার তারা যেন দেশীয় শিক্ষাটা পাই। দেশের সাথে যেন তাদের নাড়ির যোগ তৈরি হয়। তাঁর প্রত্যাশা :

> জাতীয় বিশেষত্বের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের ভাবী দেশসেবকের চরিত্র ও জীবন গঠিত হইবে, বিদেশের বিজাতির বিষাক্ত বাষ্প লাগিয়া তাদের মুঞ্জরিত জীবন পুষ্প শুকাইয়া যাইবে না, বল প্রয়োগে তাহাদিগকে মিথ্যা স্বজাতি-স্বদেশে অনাস্থা শিখাইয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী অলস-অকেজো করিয়া তোলা যাইবে না – ইহাই কি কম সুখের কথা। তাহারা শিখিবে দেশের কাহিনী, জাতির বীরত্ব, ভ্রাতার পৌরুষ, স্বধর্মের সত্য – দেশের ভাইয়ের কাছ হইতে তাহারা শিখিবে বীরের আত্মোৎসর্গ, কর্মীর ত্যাগ ও কর্ম, নির্ভীকের সাহস, দেশের উদাহরণে উদ্বুদ্ধ হইয়া – ইহা কি কম আনন্দের কথা। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২১-২২)

প্রাবন্ধিকের প্রত্যাশা আমরা যেন হুজুগে মাতাল না হয়ে, গলাবাজি করে স্টেজ না ফাটিয়ে ভাব ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করি। ভাবের স্রোতে ভেসে গিয়ে আমরা যেন কর্তব্যকে,

উচিত-অনুচিতকে ভুলে না যায়। তিনি বলেছেন :

> জনসাধারণের বা শিক্ষিত কেন্দ্রের উচিত, ভাবের আবেগে অতিমাত্রায় বিহ্বল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড ভালোমন্দ জ্ঞান হারাইয়া না ফেলা। [...] তাহা হইলে তোমার পতন, তোমার দেশের পতন, তোমার ধর্মের পতন, মনুষ্যত্বের পতন। [...] নিজের বুদ্ধি নিজের কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোল। তোমার এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যই দেশকে উন্নতির দিকে, মুক্তির দিকে আগাইয়া লইয়া যাইবে। এসব জিনিস ভাব-আবিষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া হয় না। কোমর বাঁধিয়া কার্যে নামিয়া পড়িতে হইবে এবং নামিবার পূর্বে ভালো করিয়া বুঝিয়া-সুঝিয়া দেখিয়া লইতে হইবে, ইহার ফল কি। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪১৯-২০)

প্রাবন্ধিক আরও বলেছেন :

> আর ভাবের ঘরে চুরি করিও না। আগে ভালো করিয়া চোখ মেলিয়া দেখ। কার্যের সম্ভবনা-অসম্ভবনার কথা অগ্রে বিবেচনা করিয়া পরে কার্যে নামিলে তোমার উৎসাহ অনর্থক নষ্ট হইবে না। মনে রাখিও, তোমার 'স্পিরিট' বা আত্মার শক্তিকে অন্যের প্ররোচনায় নষ্ট করিতে তোমার কোনো অধিকার নাই। তাই পাপ– মহাপাপ। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২০)

কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্বাস করতেন, দেশীয় উপাদানবহুল শিক্ষা যেভাবে জাতীয় চরিত্রের রূপগত পরিবর্তন সাধন করতে পারে, চাপিয়ে দেয়া বিজাতীয় শিক্ষা সেভাবে জাতীয় চরিত্রের রূপগত পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য চেতনাসম্পৃক্ত শিক্ষার সংস্পর্শেই ব্যক্তির সুপ্ত-প্রেরণা নির্ভীক স্পর্ধায় জেগে ওঠে; পক্ষান্তরে বিজাতীয় শিক্ষায় মানুষের আত্মসুখ ও আত্মপ্রেরণা নির্জীব হয়ে যায়। তিনি মনে করতেন, সর্বপ্রথম আমাদের সেই ধরনের শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা প্রয়োজন, যাতে থাকবে দেশের মাটির গন্ধ ও বীরদের বীরত্বের বিজয়গাথা। জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় স্বদেশের গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্তি কিশোর ও তরুণদের হৃদয়ে জ্বেলে দিতে পারে মহাশিক্ষার আলোকবর্তিকা। নজরুলের অভিমত :

> আমরা চাই, আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি এমন হউক, যাহা আমাদের জীবনশক্তিকে ক্রমেই সজাগ, জীবন্ত করিয়া তুলিবে। যে শিক্ষা ছেলেদের দেহ-মন দুইকেই পুষ্ট করে, তাহাই হইবে আমাদের শিক্ষা। 'মেদামারা' ছেলের চেয়ে সে হিসাবে 'ডানপিটে' ছেলে বরং অনেক ভালো। কারণ পূর্বোক্ত নিরীহ জীবরূপী ছেলেদের 'জান' থাকে না; আর যাহার জান নাই সে 'মোর্দা' দিয়া কোনো কাজই হয় নাই, আর হইবেও না। এই দুই শক্তিকে – প্রাণশক্তি আর কর্মশক্তিকে একীভূত করাই যেন আমাদের শিক্ষার বা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়; ইহাই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২৬)

নজরুল ইসলাম শুধু জ্ঞানার্জনের নামে শিক্ষাগ্রহণ-এর পক্ষপাতী ছিলেন না। বস্তুত, বিজাতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির অন্ধ-অনুকরণ ও অপপ্রয়োগের ফলে দেশীয় সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের সঙ্গে শিক্ষার যে সম্পর্কচ্যুতি, সেই সম্পর্কচ্যুতিকে রোধ করে দেশীয় অতীত ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপনই তাঁর শিক্ষাভাবনার মূল প্রতিপাদ্য

নজরুল ইসলাম গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিদেশি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস

ও প্রত্যয়কে দেশি ঐতিহ্যের পরিসীমা থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। আর নিজস্ব ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত শিক্ষার দ্বারা মানুষের জীবনের অভ্যন্তর ও বাহ্যিক মুক্তি অলস ও অকেজো হতে বাধ্য। তাই তিনি প্রথমেই দেশের মাটি ও মানুষ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পৃক্ত শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেছেন। তবে দেশীয় জীবনপদ্ধতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা তাঁর পরম কাঙ্ক্ষিত হলেও বিদেশি শিক্ষাকে ঢালাওভাবে বর্জনের পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। দেশীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কিংবা দেশীয় চেতনা বা বোধের পরিপন্থী নয়, এমন ধরনের বিদেশি শিক্ষা উপাদান তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি বলেছেন :

> সরকারী বিদ্যালয়ে বিদ্যালয় হয় বলিয়াই যদি আমরা তাহাকে 'তালাক' দিই, তাহা হইলে আমরা আমাদের শিক্ষার পরিপুষ্টির জন্য বা মনের মত শিক্ষা দিবার জন্য যে বিদ্যাপীঠ খাড়া করিয়াছি বা করিব, তাহা কিছুতেই ঐ সরকারী বিদ্যালয়ের নামান্তর বা রূপান্তর হইবে না। তাহা হইলে টকের ভয়ে আমরা বৃথাই বাঁধা বাসা ফেলিয়া পলাইয়া আসিলাম, কেননা আবার আমাদের আর এক রকম 'টকবৃক্ষ'-এরই ছায়াতলে আশ্রয় লইতে হইল। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২৩)

যেটুকু প্রয়োজনীয় ও গ্রহণযোগ্য – তা দেশি হোক বা বিদেশি – ভাল-মন্দ জ্ঞান-এর কষ্টিপাথরে তাকে যথার্থরূপে যাচাই করে নেয়ার পক্ষপাতী ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম।

কাজী নজরুল ইসলাম প্রত্যাশা করেছেন বিদেশি শিক্ষার প্রভাব মুক্ত এবং স্বদেশ-সংস্কৃতির প্রতি চিন্তাশীল, সৃজনশীল ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান মানুষ। কারণ তিনি জানতেন, দেশীয় শিক্ষা-ইতিহাস-সংস্কৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতিসত্তার মৌল উপাদান, বীরত্ব ও বিজয়গাথা। জাতিসত্তা-সম্পৃক্ত শিক্ষাকেই তিনি প্রকৃত শিক্ষা মনে করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতিসত্তার বোধশূন্য শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাধ্যমে জাতীয় জীবনের সার্বিক কল্যাণ সাধন অসম্ভব। সার্বিক জাতীয় কল্যাণের জন্য জাতীয় ঐতিহ্যের গর্বে উজ্জীবিত তরুণ ও যুবকদের অংশগ্রহণ প্রয়োজন। তিনি বলেছেন : "সাধারণ অসাধারণ প্রায় সকল বাঙালি মুসলমানই এখন বাংলা পড়িতেছেন, বাংলা শিখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা বড়ই আশা ও আনন্দের কথা" (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৩৮৮)। ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে কলকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণেও[১৬] তিনি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে বলেন :

> তরুণদের কাছে আমি চাই – তারা যেন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে অগ্রসর হয়। আজ আমার সম্মুখে যে তরুণ সমাজকে দেখছি, তাতে আমার নিরাশ হতে হয়েছে। তারা যেন জরায় আবৃত। জীবনের উজ্জ্বলতা ও প্রাণৈশ্বর্য আজ তাদের মধ্যে দেখতে পাই না। দুকূলপ্লাবী জীবন ও যৌবনের জোয়ার তাদের জীবনে আসুক। এটাই আজ আমি তাদের নিকট চাই। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৩৪-৩৫)

স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১) কালে প্রচলিত বিলেতি শিক্ষার শুধু উপরিকাঠামোগত পরিবর্তন ঘটিয়ে নব-প্রস্তাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে সেই শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় খুবই সামান্য দেশীয় উপকরণ ছিল, বেশির ভাগই ছিল বিলাতি উপকরণ। পরবর্তীতে অসহযোগ-খিলাফত আন্দোলনকালে আবারও জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে

এদেশীয়দের পুনর্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে নজরুল ইসলাম এই নব প্রস্তাবিত শিক্ষার স্বরূপ সম্পর্কে ভাবিত হয়েছেন।

> এখন যে পদ্ধতিতে জাতীয় শিক্ষা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসাস্থল নব-উদ্ভাবিত জাতীয় বিদ্যালয়ে দেওয়া হইতেছে, তাহাও কি ঐ রকম বিলাতি শিক্ষারই ট্রেডমার্কা উঠাইয়া 'স্বদেশী' মার্কা লাগাইয়া দেওয়ার মত। শিক্ষায় যা একটু মৌলিকতা দেখা যাইতেছে, তাহা কিন্তু বিশেষ দ্রষ্টব্য নয়। ও রকম এক-আধটু নূতনত্ব যে-কেহ একটা নূতন জিনিসে লাগাইতে পারে। যদি আমাদের এই জাতীয় বিদ্যালয় ঐ সরকারী বিদ্যাপীঠেরই দ্বিতীয় সংস্করণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই উহাকে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয় বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না, বা গৌরবও অনুভব করিতে পারি না। যাহা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব নয়, যাহা অন্যের ভুল দাগে দাগা-বুলানো মাত্র, তাহাকে কি বলিয়া কোনো লজ্জায় 'হামারা' বলিয়া বুক ঠুকিয়া তাহাদেরই সামনে দাঁড়াইব–যাহাদিগকে মুখ ভেঙ্‌চাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি আবার তাহাদেরই হুবহু 'হনুকরণ' করিতেছি। [...] কিন্তু সত্যকে অস্বীকার করিয়া ভণ্ডামি দিয়া কখনও মঙ্গল-উৎসবের কল্যাণ প্রদীপ জ্বলিবে না। শুধু চরকা দিয়া সুতা কাটানো ছাড়া এ-ন্যাশনাল বিদ্যালয়ে তেমন কিছু নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই, যাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদের দেশের ছেলেদের মনের বা এদেশের আবহাওয়ার উপযোগী। এসবই ইংরেজি কায়দা-কানুনকে যেন মাথায় পগ্‌গ ও পায়ে নাগারা জুতা পরাইয়া এদেশি করা; অথবা সাহেবকে ধুতি ও মেমকে শাড়ি পরাইয়া বাবু ও বিবি সাজানো গোছ। এর পূর্বে স্বদেশি যুগে যখন আর একবার এই রকম জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তখনো এই ব্যাপার ঘটিয়া সব কিছু পণ্ড হইয়া গিয়াছিল। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২৩-২৪)

এ থেকে বুঝা যায়, একান্তভাবেই দেশীয় মানসিকতা, আবহাওয়া ও উপাদান সম্পৃক্ত শিক্ষাই কাজী নজরুল ইসলামের কাঙ্ক্ষিত। এই শিক্ষা একটি জাতির সম্পূর্ণ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও স্বকীয়তায় গড়া শিক্ষা; কোনো বিলেতি-চিন্তা ও কর্মের উপর নতুন করে লাগানো চাকচিক্যময় প্রলেপ সর্বস্ব শিক্ষা নয়।

শুধু স্বদেশি-শিক্ষা প্রবর্তনের মধ্যেই নজরুল ইসলামের শিক্ষাভাবনা সীমিত থাকেনি। তিনি এই প্রয়াসকে সঠিকরূপে বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেছিলেন। কিন্তু স্বজনপ্রীতিমূলক শিক্ষক নিয়োগ পদ্ধতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা দেখে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যোগ্য শিক্ষকের ঘাটতিতে নব প্রবর্তিত শিক্ষা ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই তিনি বলেছেন :

> যাহারা জাতীয় বিদ্যালয়ে প্রফেসর বা অধ্যাপক নিযুক্ত হইতেছেন, তাঁহারা সকলেই কি নিজ নিজ পদের উপযুক্ত? কত উপযুক্ত লোককে ঠকাইয়া শুধু দুটো বক্তৃতা ঝাড়ার দরুন ইঁহারা অনেকেই নিজের রুটির যোগাড় করিয়া লইয়াছেন ও লইতেছেন। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২৪)

তিনি আরও বলেছেন :

> এই জাতীয় বিদ্যালয়ে কাঁচা কাঁচা অধ্যাপক নিয়োগ লইয়া যে যে ব্যাপার চলিতেছে, তাহা

> হাজার চেষ্টা করিলেও চাপা দেওয়া যাইবে না। [...] কাঁচা অধ্যাপক মানে বয়সে কাঁচা নয়, বিদ্যায় কাঁচা। [...] যে সব অধ্যাপক গোলামখানা ছাড়িয়া আমাদের বাহবা লইয়াছেন, তাহাদিগকেই যে জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যাপক করিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৪২৫)

যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষকের অভাব নব প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সকল কল্যাণকর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় যে ধস নামাবে – এজাতীয় ভাবনা নজরুল ইসলামের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায়নি। শিক্ষার্থী ও শিক্ষাদাতার মধ্যে আন্তরিক সম্পর্কের প্রতিও তিনি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন।

নজরুল ইসলাম মনে করতেন, জাতীয় বিদ্যালয়কে যথার্থরূপে গড়ে তুলতে পারলে নিজস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির সমন্বয়ে শাশ্বত মনুষ্যত্বের-চর্চা সম্ভবপর হবে এবং সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী বোধ থেকে উত্তরণের মাধ্যমে বিশ্বচেতনায় উপনীত হওয়া যাবে। আর এ ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের মাধ্যমেই আসবে আমাদের যথার্থ মুক্তি। তাঁর প্রবর্তিত শিক্ষার সঙ্গে এদেশীয় মানসবোধের সম্পর্ক সৃষ্টির অন্যতম মাধ্যম দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি। এসবের যথার্থ চর্চা ও বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে 'মঙ্গল ও কল্যাণ'-এর আগমন সম্ভব। কিন্তু ঔপনিবেশিক সরকার পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত শিক্ষাব্যবস্থায় এর বাস্তবায়ন সম্ভবপর নয়। তাঁর অভীষ্ট শিক্ষা দেশীয় ঐতিহ্যসম্পৃক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ, ব্যতিক্রমী ও সমন্বিত শিক্ষা। যে শিক্ষা ব্যক্তির ব্যক্তিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আনবে মুক্তি; ঘটাবে ব্যক্তির সঙ্গে দেশ ও কালের সঙ্গে সঙ্গতি ও সমন্বয়। তাঁর কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা হবে প্রাণশক্তি ও কর্মশক্তির সমন্বিত আধার।

নারীশিক্ষার প্রসঙ্গটিও কাজী নজরুল ইসলামের শিক্ষা-ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। মুসলিম সমাজের পশ্চাৎমুখিতা–সংকীর্ণতা দূরীকরণের লক্ষ্যে এবং জীবনকে বিকশিত করার জন্যে নারীশিক্ষাকে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন শুধু ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রয়োজনেই নয়, যোগ্যতাসম্পন্ন আগামী প্রজন্ম প্রাপ্তির জন্যও নারীশিক্ষা প্রয়োজন। "এইসব যক্ষারোগগ্রস্ত জননীর পেটে স্বাস্থ্যসুন্দর প্রতিভাদীপ্ত বীরসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে কেমন করিয়া" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১১)! সমাজ ও রাষ্ট্রের পরিবর্তন ও উন্নয়নকে সত্যিকার সাফল্যের পথে পরিচালিত করতে নারীকে শিক্ষিত করার কোনো বিকল্প নেই। নারী-পুরুষের যৌথ প্রচেষ্টাতেই সুন্দর আগামীর পথ নির্মিত হতে পারে। তাই জ্ঞানার্জনের পথে নারী-পুরুষ বৈষম্যকে তিনি উপেক্ষা করেছেন এবং শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে অধিকারহীন, পশ্চাৎপদ মুসলিম নারীর ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য ধর্মীয় সংকীর্ণতারও তিনি সমালোচনা করেছেন। 'তরুণের সাধনা'[১৭] অভিভাষণে তিনি বলেছেন :

> কন্যাকে পুত্রের মতই শিক্ষা দেওয়া যে আমাদের ধর্মের আদেশ, তা মনেও করিতে পারি না। আমাদের কন্যা-জায়া-জননীদের শুধু অবরোধের অন্ধকারে রাখিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, অশিক্ষার গভীরতর কূপে ফেলিয়া হতভাগিনীদের চিরবন্দিনী করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের শত শত বর্ষের এই অত্যাচারে ইহাদের দেহমন এমনি করিয়া পঙ্গু হইয়া গিয়াছে যে, ছাড়িয়া দিলে ইহারাই সর্বপ্রথম বাহিরে আসিতে আপত্তি করিবে। ইহাদের কি দুঃখ, কিসের অভাব যে তাহা চিন্তা করিবার শক্তি পর্যন্ত ইহাদের উঠিয়া গিয়াছে। আমরা মুসলমান বলিয়া ফখর করিব, অথচ জানি না– সর্বপ্রথম মুসলমান নর নহে – নারী। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১২)

নারীসমাজকে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়ার জন্য তিনি মুসলিম তরুণদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। বলেছেন, "তরুণদের সাধনা হউক আমাদের এই চিরবন্দিনী মাতা-ভগ্নিদের উদ্ধার সাধন" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১২)। তিনি আরও বলেছেন :

> এই পিঞ্জরের পাখির দ্বার মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। খোদার দান এই আলো-বাতাস হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার অধিকার কাহারও নাই। খোদার রাজ্যে পুরুষ আজ জালিম, নারী আজ মজলুম। ইহাদেরই ফরিয়াদে আমাদের এই দুর্দশা, আমাদের মতো হীনবীর্য সন্তানের জন্ম। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১২)

–এখানে পিঞ্জরের পাখি বলতে প্রাবন্ধিক নারীদের বুঝিয়েছেন। আর 'আলো-বাতাস' শব্দদ্বয় এখানে দ্বিমাত্রিক অর্থ সম্পন্ন; এটা দ্বারা একদিকে যেমন বাইরের উন্মুক্ত পরিবেশকে বুঝানো হয়েছে, অপরদিকে শিক্ষা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকেও নির্দেশ করা হয়েছে।

নারী কল্যাণী, আদ্যাশক্তি। পুরুষের দক্ষিণে অবস্থান করে সে সহধর্মিনী, সহকর্মিনী ও প্রেরণাদায়িনীরূপে কাজ করে। সমাজের অর্ধেক-ই তারা। তাদেরকে পিছনে রেখে মুসলিম জাতি কখনো পূর্ণাঙ্গরূপে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারবে না বলেই নজরুল ইসলাম মনে করতেন। তাই ইসলামে নারীর অবদানকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও'[১৮] শীর্ষক অভিভাষণে মুসলিম তরুণ সম্প্রদয়ের নিকট তাঁর আহ্বান :

> ইসলামের প্রথম ঊষার ক্ষণে, সুবহ্-সাদেকের কালে যে কল্যাণী নারী শক্তি রূপে আমাদের দক্ষিণ পার্শে অবস্থান করে আমাদের শুধু সহধর্মিণী নয়, সহকর্মিণী হয়েছিলেন – যে নারী সর্বপ্রথম স্বীকার করলেন আল্লাহকে, তাঁর রাসূলকে – তাঁকেই আমরা রেখেছি দুঃখের দূরতম দুর্গে বন্দিনী করে – সকল আনন্দের, সকল খুশির হিসসায় মহরুম করে। তাই আমাদের সকল শুভ-কাজ, কল্যাণ-উৎসব শ্রীহীন, রূপহীন, প্রাণহীন। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৭)

নারীকে সম্মান দেওয়ার নামে মাত্রাতিরিক্তভাবে অবরোধ করে ও পর্দার আড়ালে রেখে পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজ যেভাবে নারীদের মেধা-শক্তি-যোগ্যতার অপমান করেছে – আজ এই স্বনির্ভরতা ও আত্মশক্তি অর্জনের কালে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ যদি তার প্রায়শ্চিত্ত না করে, তাহলে আর কোনো দিনও মুসলিম সমাজের অগ্রগতি হবে না বলে নজরুল ইসলাম মনে করেন। নারীকে তার প্রাপ্য আসন ও মর্যাদা ফিরিয়ে দিতে মুসলিম তরুণ সমাজের প্রতি প্রাবন্ধিকের আকুল আবেদন :

> তোমরা অনাগত যুগের মশালবর্দার – তোমাদের অর্ধেক আসন ছেড়ে দাও কল্যাণী নারীকে। দূর করে দাও তাদের সামনের ঐ অসুন্দর চটের পর্দা – যে পর্দার কুশ্রীতা ইসলাম-জগতের, মুসলিম জাহানের আর কোথাও নেই। দেখবে তোমাদের কর্তব্যের কঠোরতা, জীবন-পথের দূরধিগম্যতা হয়ে উঠবে সুন্দরের স্পর্শে পুষ্প-পেলব। কর্মে পাবে প্রেরণা, মনে পাবে সুন্দরের স্পর্শ, কল্যাণের ইঙ্গিত। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৭)

শুধু চাকরি লাভের উদ্দেশ্য অর্জিত যে শিক্ষা, তা মানুষের ধীশক্তি ও কর্মশক্তি–উভয়কেই সীমিত করে। এরূপ শিক্ষায় প্রকৃত জ্ঞান আহরণের লক্ষ্য বাধাগ্রস্ত হয় এবং ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের প্রচেষ্টাও হয়ে ওঠে অর্থহীন। তাই শুধু চাকরি লাভের প্রত্যাশায় তৎকালের মুসলিম তরুণ সমাজের

শিক্ষিত হওয়ার প্রবণতায় নজরুল একই সঙ্গে বিস্মিত ও দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়েছেন। তিনি বলেছেন : "এদেশের শিক্ষিতদের মধ্যে সৌন্দর্যের পিপাসা কম" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৩৪)। তিনি মনে করতেন : জ্ঞান-আহরণ ও মুক্তবুদ্ধিচর্চাই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য এবং এর মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনের সার্বিক কল্যাণ অর্জন সম্ভবপর।

> আমাদের মুসলমান তরুণেরা লেখাপড়া করে, জ্ঞান অর্জনের জন্য নয়, চাকুরী অর্জনের জন্য। গাধার 'ফিউচার প্রসপেক্টের' মত আমরা ঐ চাকুরীর দিকে তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া চাহিয়া আছি। বিএ, এমএ, পাশ করিয়া কিছু যদি না হই – অন্তত সাবরেজিস্ট্রার বা দারোগা হইবই হইব, এই যাহাদের লক্ষ্য, এত স্বল্প যাহাদের আশা, এত নিম্ন যাহাদের গতি– তাহাদের কি আর মুক্তি আছে ? এই ভূত ছাড়িয়া না গেলে আমরা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইব। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১৩)

নিছক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে শিক্ষা অর্জনকে নজরুল ইসলাম পছন্দ করেননি। শুধু চাকরি লাভের জন্য পড়াশোনা না করে, প্রকৃত জ্ঞানার্জন করে সমাজ ও জাতীয় জীবনের কল্যাণ সাধনে তরুণদের এগিয়ে আসতে অনুরোধ করে তিনি বলেছেন :

> তোমাদের শিক্ষা, তোমাদের জ্ঞান অর্জন, যদি তোমাদের মাঝেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, তবে ভুলে যাও এ শিক্ষা, বর্জন করো এ জ্ঞানার্জন। নওকরির জন্য দাসখৎ লিখার কায়দা-কানুন শেখার জন্য যদি তোমরা শিক্ষার ব্রত গ্রহণ কর, তবে জাহান্নামে যাক তোমাদেরই এই শিক্ষাপদ্ধতি। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৬)

শুধু পড়াশোনা বা জ্ঞানার্জনই নয়, লেখালেখি ও সাহিত্য সৃষ্টিতেও জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়িয়ে, না হারিয়ে সর্বজনীনতা সৃষ্টির তাগিদ দিয়ে বঙ্গীয় মুসলিমদের তরুণদের তিনি বলেন :

> আমাদিগকেও তাই এখন করিতে হইবে সাহিত্যে সর্বজনীনতা সৃষ্টি। অবশ্য, নিজের জাতীয় ও দেশীয় বিশেষত্বকে না এড়াইয়া, না হারাইয়া। যিনি যে দেশেরই হউন, সকলেরই অন্তরের কতকগুলি সত্য আছে, সূক্ষ্মতম ভাব আছে, যাহা সকল দেশের লোকের পক্ষেই সমান; সাহিত্য-সৃষ্টির সময় ভিতরের এইসব সূক্ষ্মদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া জীবনের গূঢ় রহস্যকে বিশ্লেষণ করিয়া সত্যের সৌন্দর্য ও মঙ্গল ফুটাইয়া তুলিতে হইবে,– এই মহাশক্তি আমাদের তরুণ লেখক সম্প্রদায়কে অর্জন করিতে হইবে। (নজরুল, ১ম খণ্ড, ২০১২ : ৩৯০)

নজরুল ইসলাম মুসলিম তরুণদের "অন্তর মুক্ত করে বৃহৎকে জীবনে বরণ" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৩৫) করে নিতে বলেছেন। তাদের আত্মবিশ্বাসের গতি-প্রকৃতি-পরিধি কি হবে, তা নির্দেশ করে তিনি বলেছেন : "সকল বিশ্বকে, সকল সৃষ্টিকে জানব, বুঝব ও উপলব্ধি করব – এই আত্মবিশ্বাস আমাদের তরুণদের জীবনে রূপায়িত হোক" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৩৫)।

সুকুমার বৃত্তি পরিচর্যার বিষয়টি নজরুলের শিক্ষা-ভাবনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, মুসলিম সমাজের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য পুঁথিগত-জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি অবশ্যই হৃদয়বৃত্তি বিকাশের সহায়ক শিক্ষাও প্রয়োজন। সুকুমার বৃত্তিচর্চার মাধ্যমে মানুষ বাহ্যিক ও মানসিক সংকীর্ণতা থেকে উত্তরণের মধ্য দিয়ে সামাজিক ও জাতীয় কল্যাণ অর্জন

CamScanner

করতে পারে। সুকুমার বৃত্তির স্পর্শশূন্য শিক্ষাকে তিনি গৌরবহীন আত্মিক মৃত্যুরই নামান্তর বলে মনে করেছেন।

> পশুর মত সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া বাঁচিয়া আমাদের লাভ কি, যদি আমাদের গৌরব করিবার কিছু না থাকে। ভিতরের দিকে আমরা যত মরিতেছি, বাহিরের দিকে তত সংখ্যায় বাড়িয়া চলিতেছি। এক মাঠ আগাছা অপেক্ষা একটি মহীরুহ অনেক বড় – শ্রেষ্ঠ। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ১৪)

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর শিক্ষা-ভাবনায় মাতৃভাষায় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি ভিন্ন ভাষা শিক্ষার প্রতিও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, তিনি মনে করতেন, নিজস্ব ভাষার সীমানা অতিক্রম করে অপর ভাষার দুর্গে প্রবেশের মাধ্যমেই বিশ্বসভ্যতার সংস্পর্শে এসে নিজের ও অন্যের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই প্রক্রিয়ায় বিশ্ব শাস্ত্র-সভ্যতা-সাহিত্য-সংস্কৃতি-জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-ঐতিহ্য ইত্যাদি বিষয়ে পরিচিতি অর্জন করা অধিকতর সহজতর হয়। তবে বিদেশি ভাষা শিক্ষার প্রতি সমর্থন দিলেও আগে মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও সামগ্রিক ধারণা অর্জন করতে বলেছেন। কারণ, তাঁর বিশ্বাস, মাতৃভাষায় পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জনের ব্যর্থতাই অন্য ভাষায় দক্ষতা লাভের প্রধান অন্তরায়। কেবল মাতৃভাষায় পূর্ণ জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের মধ্য দিয়েই ভিন্ন ভাষা আয়ত্ত করার পথ সুগম হয়। 'মুসলিম সংস্কৃতিচর্চা'[১৯] শীর্ষক অভিভাষণে তিনি বলেছেন :

> কোনো মুসলমান যদি তার ইতিহাস ধর্মশাস্ত্র কোনো কিছু জানতে চায়, তাহলে তাকে আরবি-ফার্সি বা উর্দুর দেওয়াল টপকাবার জন্য আগে ভাল করে কসরৎ শিখতে হবে। ইংরেজি ভাষায় ইসলামের ফিরিঙ্গি রূপ দেখতে হবে। কিন্তু সাধারণ মুসলমান বাঙলাও ভাল করে শেখে না, তার আবার আরবি-ফার্সি; কাজেই ন মণ তেলও আসে না, রাধাও নাচে না। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৩)

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বিষয়টিও নজরুল ইসলামের শিক্ষাচিন্তার অন্যতম একটি মূল বৈশিষ্ট্য। তিনি আজীবন হিন্দু-মুসলমানের মিলনের চেষ্টা করে গেছেন। হিন্দু ও মুসলমানের গালাগালিকে গলাগলি এবং হাতাহাতিকে হ্যান্ডসেকে পরিণত করার স্বপ্ন তিনি আজীবন দেখেছেন। তিনি উভয় সম্প্রদায়ের জন্য এমন একটি উদারনৈতিক শিক্ষার কথা চিন্তা করেছেন, যে শিক্ষার মাধ্যমে উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে সম্যকরূপে জ্ঞাত হতে পারবে। আর এভাবে পরস্পরের সামগ্রিক পরিচয় উপলব্ধি করার পরিপ্রেক্ষিতেই তাদের পরস্পরের প্রতি বিদ্যমান বিদ্বেষমূলক চিন্তা দূরীভূত হবে। তাঁর শিক্ষাদর্শনে এই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার স্বরূপ স্পষ্ট। তিনি বলেছেন : "ভারত যে আজ পরাধীন এবং আজো যে স্বাধীনতার পথে তার যাত্রা শুরু হয়নি– শুধু আয়োজনেরই ঘটা হচ্ছে এবং ঘটাও ভাঙছে– তার একমাত্র কারণ আমাদের হিন্দু-মুসলমানদের পরস্পরের প্রতি হিংসা ও অশ্রদ্ধা" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২২)। তিনি আরও বলেছেন :

> হিন্দু আরবি, ফার্সি, উর্দু জানে না। অথচ আমাদের শাস্ত্র সভ্যতা, জ্ঞান-বিজ্ঞান সবকিছুর ইতিহাস আমাদের ঘরের বিবির মতই ঐ তিন ভাষার হেরেমে বন্দী। বিবিদের হেরেমের প্রাচীর বরং একটু করে ভাঙতে শুরু হয়েছে, ওদের মুখের বোরকাও খুলেছে, কিন্তু ঐ তিন ভাষার প্রাচীর বা বোরকা মুক্ত হল না আমাদের অতীত ইতিহাস, আমাদের ঘরের মহিমা। অতএব অন্য ধর্মাবলম্বীদের আমাদের কোন কিছু জানে না বলে দোষ দেবার অধিকার আমাদের নেই।

CamScanner

> অবশ্যই আমরাও অনুস্বারের সঙ্গিন ও বিসর্গের কাঁটা বেড়া ডিঙিয়ে সংস্কৃতের দুর্গে প্রবেশ করতে পারিনে বা তার চেষ্টাও করিনে। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৩)

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের নিকটতম প্রতিবেশী। কিন্তু এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, এত নিকটে বসবাস করেও এই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পরের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা রাখে না। প্রতিবেশীর সম্পর্কে এই অজ্ঞতা নজরুল ইসলামকে পীড়া দিয়েছে। তিনি চাইতেন এই দুই সম্প্রদায়ের অনুসারীরা যেন একে-অপরের সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা রাখে। প্রতিবেশী সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে বর্হির্বিশ্বের খোঁজ রাখাকে তিনি সমর্থন করেননি।

> আমরা ইংরাজের কৃপায়, ইংরেজি, গ্রিক, ল্যাটিন, হিব্রু থেকে শুরু করে ফ্রেঞ্চ, জার্মান, ইতালিয়ান, স্প্যানিশ, চেক, স্ক্যান্ডিনেভিয়ান, চিন, জাপানি হনলুলু, গ্রিনউইচের ভাষা জানি, তাদের সভ্যতার খবর নিই, কিন্তু আমারই ঘরের গায়ে গা লাগিয়ে যে প্রতিবেশীর ঘর তারই কোনো খবর রাখি নে। বরং ঐ না জানার গর্ব করি বুক ফুলিয়ে। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৩)

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য নজরুল ইসলাম মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে তার নিকটতম প্রতিবেশীর সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখার নিবেদন করেছেন :

> আমাদের next door neighbor – এর মন থেকে আমাদের প্রতি এই অশ্রদ্ধা দূর হবে এই এক উপায়ে, আর তবেই ভারতের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত হবে। সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার মাতলামির অবসান হবে সেইদিন, যেদিন হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা নিয়ে আলিঙ্গন করতে পারবে। সেদিন যে competition হবে সে competition হবে cultured মনের chivalrous competition-- sportsman like competition. (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৪)

ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সংখ্যগরিষ্ঠ দুটি সম্প্রদায়। ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থা এই দুটি সম্প্রদায়কে নিজ ও অপর সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা না দিয়ে দূর ইউরোপের ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য শেখানোর বন্দোবস্ত করেছে। কাজী নজরুল ইসলাম এটা পছন্দ করেননি। তিনি মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে আগে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন, পরে অন্য ধর্মাবলম্বী নিকটতম প্রতিবেশির ভাষা, ধর্ম ও রীতি-নীতি শিক্ষার কথা বলেছেন। তিনি মুসলিম তরুণ সম্প্রদায়কে প্রথমে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে চেয়েছেন, কারণ ইসলামী শিক্ষার মূলমন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ ও স্বাধীন-চিত্ততার জাগরণ। ইসলামের শিক্ষা মানুষকে সবধরনের ভীরুতা, কাপুরুষতা, দীনতা, দুর্বলতা অতিক্রম করে মুক্ত জীবনযাপনের পথ নির্দেশ করে। তিনি চান জাতির আগামী দিনের কর্ণধারদের সর্ববিধ প্রতিকূলতা অতিক্রম করার, নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন না দেবার, পরমুখাপেক্ষী না হওয়ার ও অন্যের করুণায় বা আনুকূল্যে জীবনের বিকাশ সাধন না করার শিক্ষা দিতে।

> সকল ভীরুতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বিসর্জন দিতে হবে। ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে নয়, ন্যায়ের অধিকারের দাবীতেই আমাদিগকে বাঁচতে হবে। আমরা কারও নিকট মাথা নত করব না – রাস্তায় বসে জুতা সেলাই করব, নিজের শ্রমার্জিত অর্থে জীবনযাপন করব, কিন্তু কারো দয়ার মুখাপেক্ষী হব না এই স্বাধীনচিত্ততার জাগরণ আজ বাঙলার মুসলমান তরুণদের মধ্যে দেখতে চাই। ইহাই

ইসলামের শিক্ষা; এ শিক্ষা সকলকে গ্রহণ করতে বলি। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৩৫)

মাতৃভাষায় প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য নজরুল ইসলাম অনুবাদের ওপরও জোর দিয়েছেন। তিনি মনে করতেন : মাতৃভাষায় কোনো জ্ঞান যতো ভালোভাবে অর্জন ও প্রকাশ করা যায় বিভাষায় তা সম্ভবপর নয়। আজকে বাংলার হিন্দু মুসলমানদের সম্পর্কে এবং মুসলমানেরা যে হিন্দুর ধর্ম-ইতিহাস-সাহিত্য-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারছে তা আসলে সম্ভবপর হয়েছে অনুবাদের দ্বারাই। এই অনুবাদের ধারাকে সচল রাখার জন্য তিনি মুসলিমদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন :

> আপনাদের মারফতে বাংলার সকল চিন্তাশীল মুসলমানদের অনুরোধ করছি, আপনাদের শক্তি আছে, অর্থ আছে – যদি পারেন মাতৃভাষায় আপনাদের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ইতিহাস-সভ্যতার অনুবাদ ও অনুশীলনের যেখানে হোক প্রতিষ্ঠা করুন। তা না পারলে অনর্থক ধর্ম ধর্ম বলে ইসলাম বলে চিৎকার করবেন না। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৩)

ঔপনিবেশিক শিক্ষায়তনের বিকল্প হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম চাইতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনের মতো মুসলিমদেরও কালচারের, সভ্যতার ও জ্ঞানের সেন্টার বা কেন্দ্রভূমি থাকা দরকার। তাই, চট্টগ্রামের মুসলিমদের 'চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন :

> আপনাদের ইসলামাবাদ হোক ওরিয়েন্টাল কালচারের পীঠস্থান– আরফাত ময়দান। দেশ-বিদেশের তীর্থ-যাত্রী এসে এখানে ভিড় করুক। আজ নব জাগ্রত বিশ্বের কাছে বহু ঋণী আমরা, সে ঋণ আমরা শুধু শোধই করব না– ঋণ দানও করব, আমরা আমাদের দানে জগতকে ঋণী করব– এই হোক আপনাদের চরম সাধন। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২১)

কাজী নজরুল ইসলাম দেশের সকল স্তরের শ্রেণি ও পেশার মানুষের জন্যে সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলেছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি কোনো বিশেষ শ্রেণি ও পেশার মানুষের প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বৈষম্য সৃষ্টি করেননি। তিনি সর্বজনীন এই শিক্ষাকার্যক্রমকে সফল ও কার্যকর করার জন্য বিদ্যমান শিক্ষার সাথে সাথে আবহমান কাল ধরে গণমানুষের মধ্যে প্রচল শিক্ষা উপাদান-উপকরণ ও চির-অভ্যস্ত পদ্ধতি ব্যবহারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন, এসব বিরাজমান উপাদানের সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষালাভ সম্ভব। 'জন-সাহিত্য'[২০] শীর্ষক অভিভাষণে তিনি বলেছেন :

> ওদের জন্য যে সাহিত্য, ওরা এখনো যেমনভাবে পুঁথি পড়ে, আমির হামজা, সোনাভান, আলেফ লায়লা, কাছাছুল আম্বিয়া পড়ে, তখনো সেইভাবে পড়বে। ওদের সাহিত্যের মধ্য দিয়ে ওদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। যা বলবার বলতে হবে। কিন্তু যেন মাস্টারি ভাব ধরা না পড়ে। সেই জন্য তথাকথিত ভদ্র-পোষাক পরিহিত ভদ্রলোকদের নেমে আসতে হবে কাদার মধ্যে– ওদেরকে টেনে তোলার জন্য। নেমে এসে যদি ওদের ওঠানোর চেষ্টা করা যায়, তবে তো চেষ্টা সফল হবে, নইলে না। (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ২৯)

অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনে তিনি জাতি–ধর্ম-বর্ণ-গোত্র–

পেশা-আর্থ-সামাজিক শ্রেণি-অবস্থান নির্বিশেষে সর্বজনীন শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

বারো.

কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর শিক্ষাদর্শনে বিউপনিবেশিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ঘটিয়ে বুদ্ধিবৃত্তি ও সুকুমার বৃত্তিচর্চার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন করতে ও পশ্চাৎপদতার মোহনিদ্রা থেকে জাগাতে চেয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সম্মিলিত প্রয়াসে স্বাধীন ভারতবর্ষ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। স্বীয় শিক্ষাদর্শনে তিনি দেশীয় ইতিহাস-ঐতিহ্য-জীবন-সংস্কৃতির বিশেষত্ববহুল সর্বজনীন শিক্ষা, প্রকৃত জ্ঞান আহরণ, মুক্তবুদ্ধিচর্চা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বাধীনচিত্তের জাগরণ, সুকুমার বৃত্তিচর্চা, বিবিধ ধর্মীয় শিক্ষা, ভিন্ন ভাষা শিক্ষা ও নারীশিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শন স্পষ্টভাবেই বিউপনিবেশিত শিক্ষাভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

টীকা

১. *'সাপ্তাহিক বিজলী'* পত্রিকার *২২ পৌষ (১৩২৮)* সংখ্যায় 'বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের পর কাজী নজরুল ইসলাম 'বিদ্রোহী কবি' হিসেবে পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করেন। এই কবিতায় তিনি নিজেকে অনেকবার 'বিদ্রোহী' বলে অভিহিত করলেও এই অভিধাটিকে পরবর্তীতে তিনি সম্ভবত পছন্দ করতেন না। ১৯২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর রবিবার কলকাতার এলবার্ট হলে বাংলার হিন্দু-মুসলমানের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দিয়ে মানপত্র পাঠ করা হলে তিনি যে 'প্রতিভাষণ' দিয়েছিলেন, সেখানে তিনি বলেছিলেন, "আমাকে 'বিদ্রোহী' বলে খামাখা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই।" (নজরুল, ৮ম খণ্ড, ২০১৮ : ৫) এতে বুঝা যায়, শব্দটির প্রতি তাঁর সদর্থক মনোভাব ছিল না।

২. কান্ট ও হামবোল্ডট প্রস্তাবিত গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষকদের জন্য আইনের নিরাপত্তা প্রয়োজন। কারণ, ইউরোপে শুধু মধ্যযুগেই গবেষকগণ বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হননি। এটা বিশশতকেরও বাস্তবতা ছিল এবং আজও তা চলছে। তাই গবেষণাকেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার জন্য প্রধান দুটি শর্ত : ক. জ্ঞানতাত্ত্বিক : বিশ্ববিদ্যালয় হবে সার্বিক জ্ঞান প্রচার ও চর্চা কেন্দ্র খ. আইনি : বিশ্ববিদ্যালয় সার্বিক জ্ঞান উৎপাদন করবে এবং সে জ্ঞান রাষ্ট্র, ধর্ম এবং সামাজিক রীতির বিরুদ্ধে হলেও তা প্রকাশযোগ্য হবে।

৩. ১৮৬২ সালে আব্রাহাম লিঙ্কন মরিল অধ্যাদেশ (Morill Act) জারি করেন। এই অধ্যাদেশে বলা হয়েছিল, "The endowment, support, and maintenance of at least one college where the leading object shall be, without excluding other scientific and classical studies, and including military tactics, to teach such branches of learning as are related to agriculture and the mechanic arts, in such manner as the legislatures of the States may respectively prescribe, in order to promote the liberal and practical education of the industrial classes in the several pursuits and professions in life." (Morill Act, Section 4 : ১৮৬২)

CamScanner

– এই অধ্যাদেশের মধ্য দিয়ে যে কয়েক হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেগুলোকে ল্যান্ড-গ্রান্ট বিশ্ববিদ্যালয় বলা হয়ে থাকে। এই সময়েই প্রথম গ্রামের কৃষক-শ্রমিকের সন্তানের উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগ হয়েছিল। এই উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকারীদের অনেকেই কৃষি কাজে ফিরে গিয়েছিল। এই সকল ল্যান্ড-গ্রান্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরবর্তীতে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। তবে প্রথম দিকে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশই পাঠদানকারী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সরকার কর্তৃক সরাসরি পরিচালিত হত না। এই প্রতিষ্ঠানগুলো স্থানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ এবং যাজকদের দ্বারা পরিচালিত হত। ফলে স্থানীয় সংস্কৃতি এবং মূল্যবোধ এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে গভীরভাবে প্রভাবিত করত। তা ছাড়া আইভি লিগের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিল কোন না কোন চার্চের সাথে যুক্ত। সে কারণে এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান এবং গবেষণার বিষয় সার্বক্ষণিকভাবে চার্চ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। এ ছাড়া নিয়োগের ক্ষেত্রে ভাবাদর্শিক বিষয়ও বিবেচনা করা হত। ল্যান্ড-গ্রান্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হতে থাকে উনিশ শতকের শেষের দিকে। তখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো দ্বারস্থ হয় বিত্তবানদের। যেমন : জন রকফেলর তিন কোটি চার লাখ ডলার প্রদান করেন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়কে।

৪. উনিশ শতকের মধ্যভাগ অবধি অক্সফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হতে হলে কোন চার্চের সদস্য হতো। তাছাড়া সমাবর্তনে শপথ নিতে হতো ব্রিটেনের রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কার্যকলাপ বা বক্তব্য না দেয়ার। কখনও তার ব্যত্যয় হলে সনদ বাতিলের অধিকার ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আইন দুটি বাতিলের দাবি জনপ্রিয় হয়। এলদারমনি উড ১৮৩৪ সালে ব্রিটেনের সংসদে একটি বিলও উপস্থাপন করেছিলেন। বিলটি হাউজ অফ কমনস-এ পাশ হলেও হাউজ অফ লর্ডস-এ পরাজিত হয়। এতে ক্ষোভ সৃষ্টি হলে তা সামাল দিতে ১৮৩৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ পাশ করা হয়, যেখানে শিক্ষার্থীদের কোন চার্চের সদস্য হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ছিল কেবল তার অধীন কলেজের শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা নেয়া। ফলে শিক্ষার মান এবং বিষয়বস্তুর উপর নিয়ন্ত্রণ না থাকার কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় অকার্যকর ছিল।

৫. ব্রিটিশ ভারতের বোর্ড অব কন্ট্রোলের প্রেসিডেন্ট স্যার চার্লস উড ভারতবর্ষে ইংরেজি ও নারীশিক্ষা প্রবর্তনের জন্য ১৮৫৪ সালে লর্ড ডালহৌসিকে একটি পত্র লেখেন। সেখানে তিনি যে সকল সুপারিশ করেন সেগুলো উডস ডেসপ্যাচ (Wood's dispatch) নামে পরিচিত। এটি ভারতে ইংরেজি শিক্ষার ম্যাগনাকার্টা হিসেবেও আখ্যায়িত। সুপারিশসমূহে তিনি বলেন : ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা হবে স্থানীয় ভাষা, মাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা হবে ইঙ্গ-দেশীয় ভাষা (Anglo-vernacular language) আর উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার ভাষা হবে ইংরেজি। তিনি কারিগরি ও নারীশিক্ষার ওপরও গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তাঁর সুপারিশগুলো ছিল নিম্নরূপ : ক. ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা চালু করতে হবে। কারণ, ইংরেজি শিক্ষা ভারতীয়দের নৈতিক চরিত্রের উন্নয়ন ঘটাবে। খ. প্রত্যেক প্রদেশে একটা শিক্ষাবিভাগ স্থাপন করতে হবে। গ. কলকাতা, বোম্বাই এবং মাদ্রাজের মতো বড় নগরীতে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ঘ. প্রত্যেক জেলায় কমপক্ষে একটি সরকারি বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে। ঙ. অধিভুক্ত-বিদ্যালয়গুলোকে সরকারি মঞ্জুরি সহায়তা হিসেবে প্রদান করতে হবে। চ. ভারতীয়দেরকে তাদের মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। ছ. সুসংবদ্ধ-শিক্ষাপদ্ধতি হিসেবে প্রাথমিক স্তর হতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষার স্তরবিভাজন করতে হবে। জ. সরকার নারীশিক্ষায় সহায়তা করবে। ঝ. প্রাথমিক শিক্ষা দেশীয় ভাষায় প্রদান করা হলেও উচ্চশিক্ষার ভাষা হবে ইংরেজি। ঞ. সর্বস্তরের শিক্ষকদের উন্নতির জন্য

প্রশিক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।

৬. পশ্চিম ইউরোপে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিকশিত হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শীর্ষবিন্দুতে পৌছানো জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চার আন্দোলন। অনেকগুলো ধারায় বিভক্ত ছিল এই আন্দোলন। তবে নানা ধারায় আন্দোলনটি বিকশিত হলেও এগুলোর মধ্যে একটি বিষয়ে মৌল ঐক্য ছিল, আর তা হল মানুষের যুক্তির উপর প্রবল আস্থা। যুক্তিই মানুষকে জীবনে পথ চলার জন্য মানদণ্ড যোগাবে এবং তার সাহায্যেই মানুষ কুসংস্কার, বর্বরতা এবং অহেতুক রাগ-বিরাগের আধিপত্য থেকে মুক্তি পাবে। ইংল্যান্ডে এনলাইটেনমেন্টের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিকোণ Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) থেকে শুরু হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। তারপর John Locke (১৬৩২-১৭০৪)-এর চিন্তাধারার মধ্য দিয়ে তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে William Godwin (১৭৫৬-১৮৩৬)-এর মতো চিন্তাবিদদের কাছে পৌছায়। ফ্রান্সে এটা আমরা লক্ষ করি রেনে দেকার্ত (René Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০), ভলতেয়ার (Voltaire, মূল নাম François-Marie Arouet, ১৬৯৪-১৭৭৮) এবং দিদিরো (Denis Diderot, ১৭১৩-১৭৮৪)সহ অপরাপর পণ্ডিতদের মধ্যে। আর জার্মানিতে আমরা আলোকায়নের স্ফুরণ লক্ষ করি লিবনিৎজ (Gottfried Wilhelm von Leibniz, ১৬৪৬-১৭১৬) ও কান্ট (Immanuel Kant, ১৭২৪-১৮০৪) -এর মধ্যে।

৭. দশম বা এগারো শতকে বিহারভিত্তিক-চর্চা কমতে থাকলেও রাজা বল্লাল সেন বাংলায় জ্ঞানচর্চার ধারা পুনরায় চালু করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় শিক্ষা চর্চার জন্য বাংলার বাইরে থেকে প্রচুর ব্রাহ্মণদের নিয়ে এসেছিলেন এবং তাদের উর্বর গ্রাম দান করেছিলেন। বল্লাল সেনের নিজের লেখা *দানসাগর* গ্রন্থে তার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। বল্লাল সেনের শাসনকালে বাংলা ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় চর্চার কেন্দ্রভূমি ছিল না, কিন্তু নবাবি আমলে তা শাস্ত্রীয়চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বাংলায় নব্যন্যায় এবং স্মৃতি শাস্ত্রের প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে এবং সেখানে মুসলমান শাসকদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। যুক্তিবিদ্যা, ব্যাকরণ এবং ভাষাদর্শন সম্পর্কিত দুর্দান্ত গ্রন্থ রচনা হয়েছে সেসময়।

৮. অসহযোগ আন্দোলন ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী চলা একটি অহিংস আন্দোলন। এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে 'গান্ধী যুগ'-এর সূত্রপাত ঘটায়। আন্দোলনটি ভারতব্যাপী গণ আইন অমান্যকারী অহিংস আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বপ্রথম।

CamScanner

৯. খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান-ইসলামিক আন্দোলন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখণ্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশঙ্কা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং তুর্কি সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। ভারতে মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, ড. এম. এ আনসারী ও হযরত মোহানীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সূচিত হয়। মহাত্মা গান্ধী ১৯১৯ সালে খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তবে তুর্কিদের কাছ থেকেই খিলাফত নেতৃবৃন্দের বহিরানুগত্যের প্রতি চরমতম আঘাত আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ইসলামের খলিফা বলে পরিচিত তুরস্কের সুলতানকে মুস্তাফা কামাল পাশা সিংহাসনচ্যুত করলে ব্রিটিশ সরকার কামাল পাশাকে সমর্থন করে। তখন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়। তুর্কি জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তফা কামালের চমকপ্রদ সেক্যুলার ধারণা, হানাদার গ্রিক বাহিনীর ওপর তাঁর বিজয় এবং পরিণামে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে তুর্কি সালতানাতের বিলুপ্তি ও ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্ককে প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর এবং ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে তুর্কি খিলাফতকে বিলুপ্ত ঘোষণা করলে ভারতীয় খিলাফতীদের মোহভঙ্গ হয়। প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বহীন অবস্থায় ১৯২৪ সালে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

১০. বঙ্গভঙ্গ ভারতের তথা আধুনিক বাংলার জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। লর্ড কার্জন ব্রিটিশ-ভারতের ভাইসরয় (১৮৯৮-১৯০৫) থাকাকালে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করেন। তবে বঙ্গভঙ্গের ধারণা লর্ড কার্জনের স্বকীয় চিন্তা থেকে উদ্ভূত হয়নি। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবসমূহ ১৯০৩ সালে প্রথম বিবেচনা করা হয়। প্রস্তাবের ওপর জনমত নিরূপণের উদ্দেশ্যে লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ব বাংলার জেলাগুলি সফর করে বিভিন্ন জেলার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করেন এবং বিভক্তির ব্যাপারে সরকারের অবস্থান ব্যাখ্যা করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে বক্তৃতা দেন। সরকারের তরফ থেকে যুক্তি ছিল : প্রথমত, বাংলা সরকারের প্রশাসনিক দায়িত্বের কিঞ্চিত উপশম এবং প্রত্যন্ত জেলাসমূহে অধিক দক্ষ প্রশাসন নিশ্চিত করা। দ্বিতীয়ত, অনগ্রসর আসামকে (চীফ কমিশনার কর্তৃক শাসিত) যাতে সাগরে নির্গমপথ প্রদান করা যায় এরূপভাবে এক্তিয়ার বৃদ্ধি করার মাধ্যমে তার উন্নতিবিধান করা। অধিকন্তু, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাগুলিকে বাংলা থেকে পৃথক এবং আসামের সাথে সংযুক্ত করার প্রস্তাবও ছিল। নতুন প্রদেশটি অভিহিত হবে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' নামে, যার রাজধানী হবে ঢাকা এবং অনুষঙ্গী সদর দফতর হবে চট্টগ্রামে। তৃতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উড়িয়া-ভাষী জনগণকে একক প্রশাসনের অধীনে একত্রিত করা। অনুরূপভাবে ছোট নাগপুরকে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মধ্যপ্রদেশের সাথে যুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল। আসলে সরকারের তরফ থেকে এসকল যুক্তি দেখিয়ে বঙ্গভঙ্গ করা হলেও এর পিছনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কলকাতাকেন্দ্রিক ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে স্তিমিত করা; বাংলাভাষী জনগণের জাতীয় সচেতনতা ও ক্রমবর্ধমান সংহতির ওপর আঘাত করা; বাংলায় জাতীয়তাবাদী চেতনাকে শ্বাসরুদ্ধ করা এবং শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অতিদ্রুত বর্ধনশীল শক্তিমত্তাকে ব্যাহত করার উদ্দেশ্যে পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে পূর্ব-বাংলার মুসলিম প্রভাব বৃদ্ধিকে

CamScanner

উৎসাহিত করা। কেবল প্রশাসনিক কারণেই বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়নি, এটা করা হয়েছিল ঔপনিবেশিক শক্তি কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। এর লক্ষ্য ছিল 'বিভাজন ও শাসন' (Devide & Rule) নীতির মাধ্যমে ঔপনিবেশিক শক্তির দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষা করা। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ভারতীয় কংগ্রেস ও কলকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু নেতৃবৃন্দের ইন্ধনে তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠলে লর্ড চার্লস হার্ডিঞ্জ-এর সুপারিশে ইংল্যান্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালের ডিসেম্বর মাসে দিল্লিতে তাঁর রাজ্যাভিষেক দরবারে বঙ্গভঙ্গ-রদ ঘোষণা করেন এবং প্রশাসনিক সুবিধার জন্য কতিপয় পরিবর্তনের ঘোষণা দেন। প্রথমত, ভারত সরকারের রাজধানী কলকাতার পরিবর্তে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হবে। দ্বিতীয়ত, পাঁচটি বাংলা-ভাষী বিভাগকে একত্রিত করে একটি প্রেসিডেন্সি গঠন করা হবে যার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন সপরিষদ গভর্নর। তৃতীয়ত, বিহার, ছোট নাগপুর ও উড়িষ্যাকে অন্তর্ভুক্ত করে গঠিত প্রদেশটির শাসনকার্য পরিচালনা করবেন আইন পরিষদসহ সপরিষদ লেফটেন্যান্ট গভর্নর। চতুর্থত, আসাম চিফ কমিশনারের শাসনে প্রত্যাবর্তন করবে। ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল বঙ্গভঙ্গ-রদ করা হয়।

১১. বিশ-শতকের শুরুর দিকে ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলায় ব্রিটিশবিরোধী যে সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সংঘটিত হয় তাদের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলন (১৯০৩-১৯০৮) অন্যতম। আন্দোলনটি বিশ-শতকের শূন্য দশকে সংঘটিত হলেও এর সূত্রপাত ছিল উনিশ শতকের শেষ ভাগে। সে সময় বেশ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতা দেশবাসীকে বিলাতি পণ্য পরিহার ও দেশজ দ্রব্য ব্যবহার করে, দেশজ শিল্পের উন্নতি সাধন ও উৎসাহ প্রদানে আহ্বান জানান। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র। তিনি তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'A Voice for the Commerce and Manufacture' (১৮৭৩)তে ভারতবাসীকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করে দেশপ্রেমের আদর্শে ও সেবায় উদ্বুদ্ধ হতে আহবান জানান। কতিপয় জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬–১৯২০), লালা লাজপত রায় (১৮৬৫–১৯২৮), বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮–১৯৩২) ও অরবিন্দ ঘোষের (১৮৭২–১৯৫০) সক্রিয় উৎসাহে এই আন্দোলন জাতীয় গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও (১৮৬১–১৯৪১) এই আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে এই আন্দোলন রাজনৈতিক আন্দোলনের চরিত্র লাভ করে। ব্রিটিশ সরকার বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দিলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ শুরু থেকেই বঙ্গভঙ্গ রোধের চেষ্টা করে আসছিল। যখন কোনভাবেই তারা সরকারের ওপর ফলপ্রসূ চাপ সৃষ্টি করতে পারছিল না তখন তারা স্বদেশি আন্দোলনের আদর্শকে তাদের অভীষ্ট অর্জনে ব্যবহার করে। তারা আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীদের অনুকরণে ব্রিটিশ দ্রব্য-রীতি-নীতি-আদর্শ পরিহার করে, স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করে দেশীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে ভারতবাসীকে আহ্বান করে। ১৯০৫ সালের ১৩ই জুলাই কলকাতার বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র সর্বপ্রথম বয়কট বা বর্জন আন্দোলনের ডাক দেন। ৭ই আগস্ট ১৯০৫ সালে কলকাতার টাউন হলে এক প্রতিবাদ সভায় সর্বতোভাবে বর্জননীতি গৃহীত হয়। দেখতে দেখতে সারাদেশে বর্জন আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীদের সকল ব্রিটিশ পণ্য বিশেষত বস্ত্র, তামাক, চিনি, লবণ, সিগারেট ও বিলাসজাত সামগ্রী বর্জনের একটা উদ্দেশ্য ছিল; তা হলো দেশীয় শিল্পের উন্নয়ন বিধান করা, দেশকে স্বনির্ভর করে তোলা ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে সরকারকে বঙ্গভঙ্গ-রদ করতে বাধ্য করা। তারা বুঝতে পেরেছিল, ভারতের বস্ত্রের বাজার যেহেতু ব্রিটিশ বস্ত্র ব্যবসায়ীদের একচেটিয়া অধিকারে তাই বিলাতি বস্ত্র পরিহার করলে ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের মালিকেরা

বাধ্য হয়ে নিজেদের স্বার্থে ব্রিটিশ সরকারকে তাদের সিদ্ধান্ত বাতিলের জন্যে চাপ প্রয়োগ করবে। ফলে ব্রিটিশ সরকার বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ থেকে সরে আসবে। স্বদেশি আন্দোলনের কারণে ভারতে বিলেতি দ্রব্যের আমদানি অনেকখানি কমে যায়। ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলিতে এজন্যে স্বদেশিদের তীব্র নিন্দা করা হয়। আন্দোলনের ফলে দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় একদিকে যেমন দেশীয় বস্ত্রশিল্পের প্রসার ঘটে তেমনি জন্ম হয় বস্ত্রশিল্পকেন্দ্রিক এক ধনিক শ্রেণির। আসলে স্বদেশি আন্দোলন ছিল একটা অর্থনৈতিক অস্ত্র কিন্তু তা ব্যবহার করা হয়েছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে।

১২. ১৩২৯ সালের ১২ই মাঘ তারিখের ধূমকেতু, ১৩২৯ সালের মাঘের 'প্রবর্তক', ১৩২৯ সালের ফাল্গুনের 'উপাসনা', এবং ১৩২৯ সালের ফাল্গুনের 'সহচর' প্রভৃতি সাময়িকপত্রে 'রাজবন্দীর জবানবন্দী' প্রকাশিত হয়। 'ধূমকেতু'র মামলায় কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেলে আটক থাকাকালে ৭ই জানুয়ারি রবিবার ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে এই জবানবন্দী আদালতে দাখিল করা হয়েছিল।

১৩. *যুগবাণী* ১৯২২ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মোতাবেক ১৩২৯ বঙ্গাব্দের কার্তিক মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে নজরুল ইসলাম সান্ধ্য দৈনিক 'নবযুগ'-এ যে সকল সম্পাদকীয় লেখেন, তারই কতকগুলি এতে গ্রন্থবদ্ধ হয়। তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ও বাজেয়াপ্ত করে। এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয় ১৯৭৭ সালে। এর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে এবং তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে। গ্রন্থটির শেষ প্রবন্ধ 'জাগরণী' ১৩২৭ বঙ্গাব্দের আষাঢ়ের 'বকুল'-এ 'উদ্বোধন' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি শ্রীবারেন্দ্রকুমার সেনগুপ্ত কে উৎসর্গ করা হয়।

১৪. ১৯২২ সালের ১১ই আগস্ট অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা 'ধূমকেতু'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। কাজী নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'তে যে সকল সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ লেখেন তারই কতকগুলি সংগ্রহ করে *দুর্দিনের যাত্রী* প্রবন্ধগ্রন্থটি কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ৫৪ পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধ সংকলনটিতে কোনো প্রকাশ সাল ছিল না তবে অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম গ্রন্থটি ১৯২৬ সালে প্রকাশিত বলে মনে করেন। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই গ্রন্থটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

১৫. *রুদ্র-মঙ্গল* প্রবন্ধগ্রন্থটি মোট ৭৮ পৃষ্ঠার। গ্রন্থকার নিজেই এটি প্রকাশ করেন। গ্রন্থটিতে প্রকাশকালের উল্লেখ ছিল না। 'ভট্টাচার্য প্রিন্টিং ওয়ার্কস', ২ নিবেদিতা লেন বাগবাজার কলিকাতা থেকে এটি প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়। পরবর্তীতে গ্রন্থটি বর্মন পাবলিশিং হাউজ থেকে প্রকাশিত হয় বলে আলী আহমদ উল্লেখ করেছেন। প্রকাশকাল সম্ভবত ১৯৭৭ খ্রি.।

১৬. ১৩৪৭ সালে কলিকাতার বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির ঈদ-সম্মেলনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ হিসেবে 'স্বাধীন চিত্ততার জাগরণ' প্রবন্ধটি পঠিত হয়।

১৭. ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর সিরাজগঞ্জ নাট্যভবনে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনের সভাপতিরূপে কাজী নজরুল ইসলাম 'তরুণের সাধনা' শীর্ষক অভিভাষণটি প্রদান করেন।

১৮. কাজী নজরুল ইসলাম ১৩৪৩ সালে ফরিদপুর জেলা মুসলিম ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতি হিসেবে 'বাঙলার মুসলিমকে বাঁচাও' শীর্ষক অভিভাষণটি প্রদান করেন।

১৯. ১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রাম এডুকেশন সোসাইটির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে কাজী

CamScanner

নজরুল ইসলাম 'মুসলিম সংস্কৃতিচর্চা' শীর্ষক অভিভাষণটি প্রদান করেন।

২০. ১৯৩৮ খ্রিষ্টাব্দে কলিকাতা ৫নং ম্যাঙ্গো লেনে দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার অফিসগৃহে জন সাহিত্য সংসদের শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম 'জন-সাহিত্য' শীর্ষক অভিভাষণটি প্রদান করেন।

সহায়কপঞ্জি

আজহারউদ্দীন খান (১৩৬৫)। *বাংলা সাহিত্যে নজরুল*। ডি. এম. লাইব্রেরি, কলিকাতা।

আবদুল কাদির (১৯৮৯)। *নজরুল প্রতিভার স্বরূপ*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

কাজী নজরুল ইসলাম (২০১২)। *নজরুল রচনাবলী প্রথম খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৮)। *নজরুল রচনাবলী দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৯)। *নজরুল রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৫)। *নজরুল রচনাবলী চতুর্থ খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৬)। *নজরুল রচনাবলী পঞ্চম খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০০৯)। *নজরুল রচনাবলী নবম ও দশম খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৬)। *নজরুল রচনাবলী একাদশ খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৭)। *নজরুল রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(২০১৭)। *নজরুল রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড জন্মশতবর্ষ সংস্করণ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

গোলাম মুরশিদ (২০১৮)। *বিদ্রোহী রণক্লান্ত : নজরুল জীবনী*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

তাহা ইয়াসিন (২০১৩)। *নজরুলের জীবনবোধ ও চিন্তাধারা*। নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা।

ফখরুল চৌধুরী (২০২১)। *বিউপনিবেশায়ন*। ভাষাপ্রকাশ, ঢাকা।

বিশ্বজিৎ ঘোষ (১৯৯৩)। *নজরুল মানস ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

(সম্পা., ২০১৭)। *সৃষ্টি সুখের উল্লাস (প্রথম খণ্ড)*। কথাপ্রকাশ, ঢাকা।

মহীবুল আজিজ (২০০৭)। *ঔপনিবেশিক যুগের শিক্ষা-সাহিত্য*। ঐতিহ্য, ঢাকা।

মুনতাসীর মামুন (২০১৫)। *ঔপনিবেশিকোত্তর ঔপনিবেশিক মন*। সময় প্রকাশন, ঢাকা।

রফিকুল ইসলাম (১৯৯১)। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সাহিত্য*। কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।

(১৯৯৭)। *কাজী নজরুল ইসলাম : জীবন ও সৃষ্টি*। কে পি বাগচী এন্ড কোম্পানী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (২০১২)। *রবীন্দ্রসমগ্র খণ্ড ১৬*। পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

শিশির ভট্টাচার্য্য (২০১৮)। *বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস : আদি পর্ব*। প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

সুশীল ভট্টাচার্য (২০১২)। *নজরুলের জীবন ও সাহিত্য*। রূপম প্রকাশনী, পাবনা।

সৈয়দ নিজার (২০১৮)। *বিশ্ববিদ্যালয় : উদ্ভব, বিকাশ এবং বিউপনিবেশায়ন*। প্রকৃতি-পরিচয়, ঢাকা।

Christopher Clark (2007). *Iron Kingdom : The Rise and Downfall of Prussia 1600-1947*. Penguin, London।

Frantz Fanon (2005). *The Wretched of the Earth*. Grove Press, New York।

Jacques Verger (1992). *A History of the Universities in Europe: Universities in middle age, Vol-1*. Cambridge University Press, Cambridge।

Ngugi Wa Thing'O (1986). *Decolonising the Mind : The Politics of Language in African Literature*. Heinemann Educational, London।

Thomas Babington Macaulay (1835) 'Minute on Education'
http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00generallinks/macaulay/txt_minute_education_1835.htm

CamScanner

CamScanner